কাকলিমুখর

কিশোর উপন্যাস

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেংগল বাইণ্ডার্স

দাম দুই টাকা।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা

এর যত মূল্য সে কী ধরার ধূলায় হবে হারা ?

স্বর্গ কি হবে না কেনা ?

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা এতো ঋণ

রাত্রির তপস্যা সে কী আনিবে না দিন ?

প্রাগ্‌বাক

বেশ কয়েক বছর আগে, আমার বয়ঃসন্ধিকালে এই উপন্যাসটির রচনা। নানাকারণে এতোদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে প্রকাশ করা গেল। যাদের উদ্দেশ্যে এ বই লেখা তারা পড়ে তৃপ্তি পেলেই আমি আনন্দিত হবো।

আরো একটি কথা বলে রাখা ভালো, এ উপন্যাসের সকল চরিত্রই কাল্পনিক। আর যদি সত্যি সত্যি আমার অজ্ঞানতা বশতঃ কোথাও কোনো মন্তব্য বা উক্তিতে কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হন, তাহলে সেজন্য আমি পূর্বাহ্ণেই তার বা তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে, আমি জানি এর উপযুক্ত মূল্যলাভ হবে সত্যানুসন্ধীর কাছে।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

গোরাচাঁদ দাস রোড,
বরিশাল।

সেদিন স্কুল ছুটির পর বরুণ কামালকে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাদের বাড়িতে লইয়া আসিল।

কামাল তো আসিতেই চাহেনা। তাহার আবার লজ্জা বিপুল। স্বভাবতঃই সে নির্জন নিরীহ প্রকৃতির বলিয়া ভীড় এড়াইয়া থাকিতেই ভালোবাসে। তবু, ঠিক তাহার উল্টা-প্রকৃতির সহপাঠি বরুণের সংগে তাহার গভীর বন্ধুতা; এ বন্ধুতা বিচিত্র হইলেও ক্লাশের অন্যান্য ছেলেরা যাহারা তাহাদের ভালো করিয়াই জানে, তাহাদের নিকট বিস্ময়কর কিছু নয়। তাহারা জানে, দুইজনেই চেহারায়, স্বভাবে, লেখাপড়ায় অন্যান্য ছেলেদের অনেক উর্ধে। দুইজনেই কবি। এমন কী বরুণ যাহা ভাবে, কামালও তাহাই। কেবল পাঠ্যপুস্তকের কথা লইয়াই নয়, বাইরের পৃথিবীর নানা কথা সমস্যা লইয়া তাহাদের মধ্যে যে আলোচনা হয়, তাহার মধ্যেও দুইজনের ভাবধারার আশ্চর্য ঐক্য। সুতরাং এতো মিল থাকিতে তাহাদের মধ্যে যে সুনিবিড় বন্ধুতা গড়িয়া উঠিবে ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে।

কিন্তু অমিলও আছে যথেষ্ট। বরুণ বড়োঘরের ছেলে, কামাল গরিবের। কামাল যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিয়া

বাড়িয়া উঠিতেছে—সেখানে উদ্যতনখর দারিদ্র্য, প্রতি পদক্ষেপে হিংস্র আক্রমণ করিয়া তরুণ প্রাণকে অকালে বার্ধক্য জর্জর করিয়া কোমল মুখের উৎসাহদীপ্ততা কাড়িয়া লইয়া গম্ভীর বিষণ্নতা মাখাইয়া দিয়া যায়। তরুণ মন আশাআকাঙ্খা পরিপূরণের পথ না দেখিয়া নৈরাশ্যের অন্ধকারে মগ্ন হইয়া পড়ে; চৌদ্দবৎসরের কিশোরের মুখেও বৃদ্ধের গাম্ভীর্য মনকে পীড়িত করে। কামালও এই বিষণ্নতা হইতে মুক্তি পায় নাই। জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে, জ্ঞানলাভ করিতে করিতে, নিজের সবুজ আশাআকাঙ্খা লইয়া যেদিকে পা বাড়াইয়াছে সেদিকেই দেখিয়াছে উদ্যতফণা দারিদ্র্য ছোবল তুলিয়া তাহাকে বাধা দিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। কিন্তু তবু সে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—পৃথিবীর বহু দুঃখজয়ী জীবনের কথা স্মরণ করিয়া সেও এই দুঃখকষ্টকে জয় করিবার সংকল্পে মনকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছে। সংগে সংগে মনকেও প্রশ্ন করিয়াছে কেন এই কষ্ট, কেন এই দারিদ্র্য? পৃথিবীতে এতো সম্পদ থাকিতে মানুষ কী সার্থক সুন্দর হইয়া বাঁচিতে পারিবে না?

ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে পালিত হইলে কী হইবে, বরুণের মনকেও ঠিক এই প্রশ্নই আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। সে যে পরিবেশের মানুষ, সেখানে হয়তো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, অভাব নাই, কিন্তু তবু এই তরুণবয়সেও মানুষের প্রতি এক প্রগাঢ় মমত্ববোধ তাহার সুন্দর চরিত্রটিকে আরো রমণীয় করিয়াছে। সে'ও দেখিয়াছে সমাজে একদল মানুষ তাহাদেরি

মতো প্রচুর ঐশ্বর্যে বিলাসে জীবন উপভোগ করিতেছে, অন্যদিকে বিরাট অন্য একদল নিয়ত অভাবে দৈন্যে নিষ্পিষ্ট হইয়া, জীবনধারণের জন্য প্রবল সংগ্রাম করিয়াও পরাজিত হইতেছে। অথচ এই ভয়ংকর অন্যায় ও অসাম্যের প্রতি কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, সকলেই আপন আপন স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত। এমন কী তুচ্ছ তুচ্ছ স্বার্থ উপলক্ষ্য করিয়া মানুষে মানুষে হানা-হানি দ্বন্দ্বের বিরাম নাই। মানুষ কী এই তুচ্ছ আত্মকলহ ভুলিয়া এমন এক পৃথিবী রচনা করিতে পারেনা যেখানে কোন কষ্ট নাই, অভাব-অভিযোগ নাই, সফল ও সার্থকভাবে প্রত্যেকটি মানুষ জীবন অতিবাহিত করিয়া যাইতেছে· ····

দুইবন্ধুই তাহাদের এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়াছে স্কুলে নবাগত শিক্ষক দিবাকরবাবুর কাছে। দিবাকরবাবু বয়সে যুবক। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং আরো সুন্দর তাহার চরিত্রটি। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্কুলের সকল ছেলেদেরি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। মাঠের খেলা, বিতর্ক সভা ইত্যাদি কিছুই তাঁহার নেতৃত্ব বিনা আর সুসম্পন্ন হয় না। ছেলেরা যেমন তাঁহাকে ভালোবাসে, তেমনি করে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা।

তিনি স্বভাবতঃই একটু বিষণ্ণ। বড়ো বড়ো দুইটি চক্ষু যেন সর্বদা স্বপ্নময়। সেই স্বপ্নময় চক্ষু দুটিতে অশেষ আশার জ্যোতি জ্বালাইয়া তিনি বলিয়াছেন,—পারবে বই কী! নিশ্চয়ই এই পৃথিবী—আমাদের এই দুঃখভরা দেশ সব দুঃখ

কষ্ট অতিক্রম করে শত শত শুভজীবনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু সে দিন এখনো অনাগত। তোমরাই রচনা করবে তার সূর্য...ভগীরথের মতো এই মরা-দুনিয়ায় তোমরাই আনবে তার নবজীবনের প্রাণধারা......

সুসজ্জিত ড্রইংরুমে তাহাকে বসাইয়া বরুণ কহিল,—বোস তুই, আমি আসছি।

বরুণ ভিতরে চলিয়া গেল। ঘরের চারিদিক চাহিয়া কামালের চক্ষু যেন জুড়াইয়া গেল। সোফা, দেয়ালের বড়ো বড়ো ছবি, এখানে ওখানে টাঙানো পাতলা রঙীন পর্দা ঘরের মধ্যে এক বিচিত্র বর্ণিল স্বপ্ন রচনা করিয়াছে। ইহার পাশে নিজের দারিদ্র্য-জর্জর ঘরের চেহারা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে সংকুচিত হইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্দা সরাইয়া সৌম্যা মাতৃরূপিণী একজন মহিলা প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—তোমারই নাম কামাল?

কামাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, ভীতস্বরে কহিল,—হ্যাঁ।

—আমার মা।—বরুণ পরিচয় করাইয়া দিল।

কামাল এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া আগাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। বরুণের মা স্মিতমুখে আশীর্বাদ করিয়া

কহিলেন,—থাক বাবা হয়েছে। তোমার কথা বরুণের মুখে বহুবার শুনেছি। কোথায় বাড়ি তোমাদের?

কামাল ঠিকানা বলিল। বরুণের মা খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহার বাবা মা এবং বাড়ির অন্যান্য খবরও জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপ ছোটখাটো আলাপের মধ্য দিয়া কামালের আড়ষ্টতা অনেকখানি কাটিয়া গেল। খানিক পরে বরুণের মা কহিলেন,—খুব লাজুক মনে হচ্ছে তোমাকে—এসো আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে, লজ্জা কিসের!

বরুণ বলিল,—ওর সবকিছুর জন্য ওকে প্রশংসা করা চলে মা, কেবল এই দোষটি ছাড়া।

কামাল প্রতিবাদ করিয়া উঠিল,—বাঃ লজ্জা করবো কেন? আমি এমনিই কথা একটু কম বলি।

বরুণের মা উঠিয়া বলিলেন,—তা ভালো। বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই কথা কম বলতেন। তোমরা বোসো বাবা, আমি আসছি।

তিনি চলিয়া গেলে কামাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, খামোকা টেনে তো নিয়ে এলি—এবার আয় কাজের কথা হোক।

বরুণ তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিল,—হ্যাঁ শোন, সমিতির নাম দেবো সবুজ সংঘ; উদ্দেশ্য অনেক কিছু। সে সব সবাই মিলে এক জায়গায় বসে যা-হয় স্থির করা যাবে। আপাততঃ অফিস ঘরের জন্য বাবাকে বলে আমাদেরি বাড়ির

একটা ঘর নেবো। কাল থেকেই সভ্যসংগ্রহ শুরু করবো। চাঁদা চার আনা করেই ধরা যাক, কী বলিস?

কামাল আপত্তি করিল,—চার আনা বেশি হবে। দু'আনাই ভালো। দু' আনা করে করলেও আমার ভয় হয়, এখন যেমন সবাইর উৎসাহ আছে, চাঁদা দেবার কথা উঠলেই অনেকে সরে পড়বে।

—আমার মনে হয় দু' আনা করে সবাই দিতে পারবে।

—নিজের দিক দিয়ে বিচার করছিস কি না! তোর মতো সবাই তো 'বড়লোক' নয়!

বরুণ ব্যথিত ভাবে খানিকক্ষণ কামালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল,—জন্মেছি সত্যি বড়োলোকের ঘরে, কিন্তু সেটা কী এমনি একটা অপরাধ যে তুই বারবার এমনি করে খোঁচা দিবি কামাল?

কামাল হাসিয়া ফেলিল,—'বড়োলোক' বললেই তুই মনে করিস বুঝি গাল দিলাম!

—আমার তাইতো মনে হয়। দেশের অধিকাংশ লোক গরিব। চারদিকে তাকিয়ে যখন দেখি তাদের—মনে হয় আমরা বড়োলোক হয়ে জন্মে মহা অপরাধ করেছি।

—আমি কিন্তু তোকে গাল দিয়ে বলিনি! কামাল অপ্রতিভ হইয়া কহিল। বরুণ তাহার একখানা হাত টানিয়া লইয়া বলিল—তা জানি!

সিঁড়িতে চটপট কাহার পায়ের শব্দ বাজিয়া উঠিল। কে

যেন গাহিতে গাহিতে উঠিয়া আসিতেছিল—বাংলার মাটি, বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

বরুণ উজ্জ্বল মুখে বলিল,—আমার বোন সবিতা।

ঘরে ঢুকিয়া বরুণকে দেখিয়া সবিতা গান থামাইয়া কী বলিতে যাইতেছিল, কামালকে লক্ষ্য করিয়াই মাঝপথে থামিয়া গেল।—থাক, পরে বলবো। বলিয়া রক্তিমমুখে সে বই হাতে ছুটিয়া পলাইল।

বরুণ হাসিয়া উঠিল,—এই তোর মতো আরেকটি লাজুক জীব কামাল। অপরিচিত লোকের সামনে বোমা মেরেও কথা বার করা যাবে না।

কামাল স্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিল।

—এই গানটাই আমাদের মূলমন্ত্র হবে কামাল। বরুণ হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া উৎসাহধ্বনি করিয়া উঠিল।

কামালও কথাটা খেয়াল করিয়া উৎসাহিত হইল,—ঠিক, সোনার বাংলার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই হবে আমাদের সংঘ গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা বাঙ্গালী, বাংলার জয়গানই প্রথম আমরা গাইবো।

বেয়ারার হাতে খাবার লইয়া বরুণের মা আবার আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বরুণ বলিয়া উঠিল,—আচ্ছা মা আমরা স্কুলের বন্ধুরা মিলে একটা সমিতি গড়বো স্থির করেছি। নাম দিতে চাই সবুজ সংঘ। কেমন হবে মা?

খাবারের প্লেটগুলি টিপয়ে সাজাইতে সাজাইতে বরুণের

মা চক্ষু না তুলিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—হঠাৎ এ খেয়াল! উদ্দেশ্য?

বরুণ হাসিয়া কহিল,—খেয়াল নয় মা, সংকল্প। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে দেশের যতোটা কল্যাণ করতে পারি তারি চেষ্টা করবো এই সমিতির মধ্য দিয়ে।—

বরুণের মা চোখ বড়োবড়ো করিয়া কৌতুকের সঙ্গে মন্তব্য করিলেন,—ওঃ বাবা! দেশবন্ধু সি, আর, দাশ!

কামাল তাঁহার ভংগি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বরুণের মুখের সকল আলো যেন দপ করিয়া নিভিয়া গেল।

—নাও কামাল খেয়ে ফেলো।......তা কাগজে কলমে বক্তৃতায় দেশ উদ্ধারের মতলব করেছো বুঝি?

বরুণ সে কথায় কোনো উত্তর দিল না। তেমনি গম্ভীর অন্ধকার মুখে ধীরে ধীরে বলিল,—মা, তুমি ব্যঙ্গ করলে? আমি দেশবন্ধু সি, আর, দাশের মতো বড়ো হওয়ার দম্ভ করিনে, দেশের সামান্যতম কল্যাণের কাজেও যদি আমি জীবন উৎসর্গ করতে পারি, তাহলেই ধন্য হবো। কিন্তু তুমি সব কথা না শুনেই এমনভাবে ব্যঙ্গ করবে এ জানলে কখনো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতুম না।

বরুণের মা বিস্মিতভাবে তাহার ছলোছলো চক্ষুর দিকে তাকাইলেন। তাড়াতাড়ি কহিলেন,—এই ছাখো, ছেলে আমার অভিমান করলে! ছাখোতো বাবা কামাল, আমি কি ওকে ব্যঙ্গ করলাম?

—অমন করে বলার মধ্যে তাছাড়া আর কী আছে। ভেবেছিলাম একাজে তোমার আশীর্বাদ পাবো, তা গোড়াতেই আমার সে আশা অনেকখানি নিভে গেলো মা!

বরুণের মা ধীরস্বরে কহিলেন,—পাগল ছেলে! ওরে, ব্যঙ্গ আমি করিনি; তোদের সংকল্প শুনে বরং আমি বিস্মিত হয়েছি। তোদের মতো বয়সের—এদেশের এই ছেলে-মেয়েদের এই দিনে এর চাইতে শুভসংকল্প আর কিছু হতে পারে না। আশীর্বাদ করবোনা! তোদের এই শুভ-সংকল্পে মা ছাড়া কে আর মনভরা আশীর্বাদ করবে বল?

বরুণ হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—সত্যি মা?

—হ্যাঁরে,— প্রাণভরে তোদের আশীর্বাদ করছি!

কামাল চুপ করিয়া ছিল এতোক্ষণ। এইবার সেও উৎসাহের আবেগে বলিয়া উঠিল,—আপনি সত্যিই 'মা'!

—তবে কী মিথ্যে মা নাকিরে পাগল! -বলিয়া হাসিয়া বরুণের মা তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। —নাও এবার খাবারটা খেয়ে ফেলো তো!

বরুণদের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া কামাল আনন্দে যেন হালকা হইয়া উড়িয়া চলিল। কী মধুর ব্যবহার বরুণের মার, কী চমৎকার তাঁহার কথাবার্তা, চেহারা। আর বরুণ যে তাহারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু একথা ভাবিতেও সে অধীর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

কিন্তু নিজের বাড়ির কাছে আসিয়াই অনেকখানি আনন্দ নিভিয়া যায় কামালের। জীর্ণ টিনের ঘর—তাহার দারিদ্র্য-মলিন পরিবেশ যেন সকল আশা আনন্দকে সর্বদাই টুঁটি চাপিয়া মারিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আছে। অতি অল্প বয়সেই ইহা উপলব্ধি করিয়া কামাল অকালেই বুড়োটে হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু তবু, আর্থিক দিক হইতে সংসারে অসচ্ছলতা থাকিলেও তাহার পিতামাতা বোনদের চরিত্রে কোনো গুণ বা মাধুর্যের অভাব ছিলনা। চরিত্রের এইসব সৌন্দর্য পরিবারের সকলেই পাইয়াছে তাহার পিতা রহমান সাহেবের নিকট হইতে।

রহমান সাহেব অভাবগ্রস্ত মানুষ। অখ্যাত, অজ্ঞাত। তবু কেহ কোনোদিন কোনো কালিমা তাঁহার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেখে নাই। শৈশব হইতেই এই সদাহাস্যময় পিতাকে কেন্দ্র করিয়া কামালের মনে এক রহস্য পরিবৃত শ্রদ্ধালুতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

সেদিন বাড়ি ফিরিতেই তিনি কামালকে ডাকিয়া বলিলেন, —একটা কাজ করে আয়তো কামাল—আমার শরীরটা ভালো নেই—

—কী কাজ বাবা ?

—এই চিঠিটা সুরেনবাবুর বাড়িতে দিয়ে আয়। চিনিস তো সুরেন বাবুকে ?

—হ্যাঁ, তোমাদের অফিসে যিনি কাজ করেন?

—হ্যাঁ।

বাড়ির ঠিকানা জানিয়া লইয়া কামাল বাহির হইয়া পড়িল।

সুরেনবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া ডাকাডাকি করিয়া কাহারও সাড়া মিলিল না।

অগত্যা খোলা দরজার পথে কামাল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ছোটো একতলা বাড়ি।

কিন্তু কোনোঘরেই কেহ নাই। সাজানো গোছানো ঘরদুয়ার, অথচ লোকগুলি গেল কোথায়?

উঁকিঝুঁকি দিতে দিতে কামাল ভিতরে উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, ডাকাডাকি করিয়া লাভ কী, কাহাকেও চিঠি খানা দিয়া গেলেই হইবে।

এদিক ওদিক তাকাইতে হঠাৎ তাহার চক্ষু পড়িল ছোট্টো একখানা ঘরের দিকে। একজন সাদা থান পরা মহিলা কোনো গ্রন্থ পাঠে মগ্না। তাঁহার সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ।

রামায়ণ পড়া ছিল কামালের ; তাঁহার পড়ার ভংগি শুনিয়া অনুমান করিল হয়তো তিনি রামায়ণ পড়িতেছেন।

সে সোজাসুজি তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল,—সুরেন-বাবুকে এই চিঠিটা দেবেন।

আশ্চর্য, অপরিচিতা মহিলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এতো চটপটে ভাবে সে আর কোনোদিনই কথা কহিতে পারে নাই। চটপট কাজটা করিতে পারিয়া কামাল নিজের ওপরে নিজেই খুব খুশি হইয়া উঠিল।

মহিলাটি চোখের চশমা খুলিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—কোথা থেকে আসছো? কে দিলো চিঠি?

—আমার বাবা দিয়েছেন—বলিতে বলিতে সে ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে এমন সময় মহিলাটি হা হা করিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—আহা-হা ঘরে ঢুকোনা, জুতো পায়ে ঢুকোনা।

কামাল ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি, ভয় পাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

মহিলাটি অপ্রসন্ন মুখে উঠিয়া কহিলেন,—কোথাকার ছেলে তুমি বাপু? হোলোতো অঘটন!

কামাল যেস্থানে পদক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাকাইয়া দেখিল, সে স্থান যে খুব অপরিষ্কার হইয়াছে তাহা নয়। তবে, কী হইল, সে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলনা। বোকার মতো তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কী হয়েছে?

—কাদের ছেলে তুমি, জুতোপায়ে পূজোর ঘরে ঢুকতে নেই, সেটুকু জানোনা?

কামাল নতমস্তকে চুপ করিয়া রহিল। মহিলাটি চিঠিখানা কে দিয়েছে জানিয়া লইয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী জাত তোমরা?

—মুসলমান।

পরক্ষণেই মহিলাটির চিৎকার শুনিয়া কামাল একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল।

—ওমা, মোছোলমান! হায় ভগবান, হোলো তো অঘটন! ওরে তা তুই আগে বললিনে কেন ছোঁড়া? কোন সাহসে ঘরে ঢুকলি?

তাহার তর্জন গর্জনে কামাল ভয়ে একেবারে এতোটুকু হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল; না পারিল কিছু বলিতে বা চলিয়া যাইতে।

এমন সময়, 'কী পিসীমা, এতো চ্যাচামেচি লাগালে কেন?'—বলিতে বলিতে একটি সুশ্রী যুবতী বই হাতে বাড়িতে আসিয়া ঢুকিল।

পিসীমা অগ্নিবর্ণ চক্ষে বলিলেন,—এই যে পূরবী এসেছিস্! ছ্যাখ কাণ্ড, আমি ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছি—এদিকে এই মোছোলমানের ছেলেটা সোজা আমার পুজোর ঘরে ঢুকে পড়েছে! কোথা থেকে কী চিঠি নিয়ে এসেছে, দেবার সময় আমার হাতও ছুঁয়ে দিয়েছে। এখন এই শীতের অবেলায় আমাকে আবার নাইতে হবে—জিগ্যেস করতো, মোছোলমানের ছেলে হয়ে কোন সাহসে বাড়িতে ঢুকলো?

পূরবী কামালের দিকে চাহিয়া দেখিল, কুণ্ঠায় সে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মত হইয়াছে। বইগুলি রাখিয়া সে তাড়াতাড়ি আবার উঠানে নামিয়া আসিল। তারপর কামালের একখানা হাত আপন হাতে লইয়া তর্জন করিয়া উঠিল,—আঃ থামো পিসীমা! ঢুকেছে তাতে হয়েছে কী যে তুমি এমন করে পাড়া মাথায় করে তুলেছো? বেচারি তোমার বাই জানলে কী আর পা বাড়াতো?

পিসিমা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, পরমূহূর্তেই গালে হাত রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—ওমা আমি কোথায় যাবো গো! পূজোর ঘরে একটা মোছোলমান ঢুকেছে, তাতে তুই বলছিস কিছু হয়নি?

—না, হয়নি। তোমার যে ঠাকুরের কাছে মুসলমান গেলে তার জাত যায়, সে কক্ষণই আসল ঠাকুর নয়। দেবতা ভগবান তোমার-আমার একলার নয় পিসীমা,—তারা যাদের তাদের হিন্দুমুসলমান জাতবিচার করে তার আশীর্বাদ ঝরেনা। মুসলমান ঘরে ঢুকেছে তাতে ঠাকুরের কোনো অনিষ্ট হয়নি, অনিষ্ট হয়েছে তোমার সংকীর্ণ মনের। তুমি বেচারিকে এভাবে অপমান কোরোনা।

পূরবী এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়া, কামালকে নরমস্বরে কহিল,—আমি তোমার অবস্থাটা বুঝতে পারছি ভাই। তা তুমি কিছু মনে কোরোনা। পিসীমার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।

কামাল এতোক্ষণ নতমস্তকে উঠানে দাঁড়াইয়াছিল। তারপর পূরবীর কথাগুলি শুনিয়া, তাহার স্নেহস্বরে চঞ্চল হইয়া বিস্মিতচোখে তাহার দিকে তাকাইল। পূরবী তাহার দিদির বয়সী। দিদির মতোই তাহার স্নেহমধুর আচরণ। তাহার শেষ কথাটি শুনিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—না না, আমারই ঢোকা অন্যায় হয়েছিলো। আমি এবার যাই—

তাহার স্বরে তখনো কুণ্ঠা ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। পূরবী স্মিতমুখে বাধা দিয়া বলিল,—না ভাই, তুমি এসো, আমার ঘরে বসবে চলো।

—না, আমি চলে যাই।

পূরবী থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিন্তু তোমার বাড়ি কোথায় জানলুমনা তো?

কামাল যথাসম্ভব সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিল। পূরবীর মনে হইল যেন চেনে; জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার কোনো বড়ো বোন স্কুলে পড়তো?

—হ্যাঁ।

—শামিম তার নাম?

এবারে বিস্মিত হইবার পালা কামালের, বলিল,—হ্যাঁ কী করে জানলেন?

—ওঃ, তুমি শামিমের ভাই। কী করে জানি জিগ্যেস করছো? স্কুলে যে একসাথে পড়তুম, খেলতুম। আমার বন্ধুকে আমি চিনবোনা!

পিসীমা ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া আবার তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কামাল ভীতচোখে পূরবীর দিকে চাহিতেই, সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল,—চলো ভাই, তোমাকে রাস্তায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

পথে নামিয়াও কামাল ঠিক ইতিপূর্বে ঘটিয়া যাওয়া ব্যাপারটার সংকোচ ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছিল না।

সত্যিই তো, কী হয় মুসলমান হিন্দুর ঘরে ঢুকিলে! হিন্দুও মানুষ, মুসলমানও মানুষ। ভাবে, একের যেরূপ অংগপ্রত্যংগ মন, অন্যেরও তাহাই। তবে এই একে অন্যকে দূরে সরাইয়া রাখিবার কী কারণ থাকিতে পারে?

ধর্ম নিয়া সে কোনোদিন মাথা ঘামায় নাই। নিজ বিচারবুদ্ধি ও বিবেককেই সর্বাপেক্ষা বড়ো ধর্ম বলিয়া তাহার মনে ধারণা জন্মিতেছিল। হিন্দু-মুসলমান ধর্মের এই আপাতঃ বিরোধিতা তাহার মনকে পীড়া দিত। সে জানিত, হিন্দুদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী আছে যাহারা নমশূদ্র মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদিকে ঘৃণা করে; সর্বদা নিজেদের তাহাদের স্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া চলে। কিন্তু এই সংকীর্ণতার কোনা সমর্থন সে খুঁজিয়া পায়না।

তাহার মনে পড়িল গান্ধিজীকে। পূরবীদির পিসীমা তো তাহার সহিত একরকম ভালো ব্যবহারই করিয়াছেন ভারতের কোনো কোনো স্থানের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে। দক্ষিণ-

ভারতে এবং আরো অনেক জায়গায় সমাজের নিম্নভাগের জনসাধারণকে এখনো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ঘৃণা করে। তাহাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই, উচ্চবর্ণদের সহিত মেলামেশার সুযোগ নাই—তাহাদের ছায়া মাড়াইলেও দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা ধর্ম থাকে না বলিয়া বিশ্বাস করে। গান্ধিজী এই অন্ধ অন্যায় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিবার জন্য অন্দোলন করিতেছেন। অর্ধ-নগ্ন ফকির, আরেকজন সিদ্ধার্থ-গৌতম সাজিয়া, নিপীড়িত হরিজনদের ব্যথার ব্যথী হইয়া তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংগ্রামে রত।

মনে পড়িল রবীন্দ্রনাথকে। নিজ দেশের এই কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসকে বেদনার সহিত লক্ষ্য করিয়া তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেই এই ধরণের অন্ধ কুসংস্কার। নহিলে, বরুণের মা'র বা পূরবীদির ব্যবহারে, কই কখনই তো সে মুসলমান বলিয়া তাহাকে অবহেলা বা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিতে পায় নাই।

অকস্মাৎ, খেয়াল না করিয়া পূরবীদের ঘরে ঢুকিয়া সে অপমানিত হইবার পর মনে যে দুঃখ এবং ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, বাড়ির পথে চলিতে চলিতে নানা কথা চিন্তা করিয়া তাহার মনে আর তাহা অবশিষ্ট রহিল না।

আমাদের দেশে,—দেশের লোকের মনে অন্যায় আছে, অন্ধ-বিশ্বাস আছে, অসংখ্য কুসংস্কার আছে। যেমন আছে হিন্দুদের মনে, তেমনি মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও। দোষশূন্য হইলে আজ আমাদিগকে পরাধীনতার গ্লানি বহন করিতে হইত না। কিন্তু এই সমস্তকে দূর করিয়া পবিত্র মানুষের দেশ গড়িয়া তোলাই তো সবুজ-সংঘের আদর্শ!

নোতুন এক কর্ম-প্রেরণার উৎসাহে কামালের দেহ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আর দেরি নয়, অবিলম্বেই সবুজ-সংঘকে কর্মে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

বাড়ির কাছাকাছি আসিতেই শুনিল, বৈঠকখানা ঘরে কাহারা তুমুল কলরব করিতেছে। তাহার বাবার সহিত কাহাদেরও কথা হইতেছে মনে করিয়া সে পাশ কাটাইয়া সোজাসুজি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

কিন্তু ঘরে মা বা তার বোন শামিম কেহ কোথাও নাই, সকলেই যাইয়া বৈঠকখানা ঘরের বেড়ায় কান পাতিয়াছে। তাহাদের গম্ভীর মুখচোখ দেখিয়া সে বিস্মিত হইল।

ধীরে ধীরে সেও যাইয়া বোন শামিমের কাছে দাঁড়াইল,—কারা এসেছে দিদি, কী হয়েছে?

শামিম তাহাকে ইংগিতে কথা বলিতে নিষেধ করিয়া

আবার ওপাশের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। কামাল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার মায়ের কাছে গেল—কী শুনছো মা, কারা এসেছে ?

—কী জানি।

—চেঁচামেচি হচ্ছে কেন ?

—তোর বাবার সংগে ঝগড়া বেধেছে।

—কেন ?

—জানিনে বাপু ! তোর অতো খোঁজে দরকার কী ! যা বাইরে থেকে খানিকটা বেড়িয়ে আয়। চিঠিটা দিয়ে এসেছিস ?

—হ্যাঁ।

কামালের মা বেড়ার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন।

ভিতরে খুব উত্তেজিত কণ্ঠে কাহারা তর্ক করিতেছে। তাহার বাবার স্বর ধীর শান্ত। এবং এতো শান্ত যে আগন্তুকদের কণ্ঠস্বরের কোলাহলে তাঁহার কথা পর্যন্ত শোনা যাইতেছে না।

কামাল অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। আগন্তুকদের দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

পাঁচ সাত জন লোক সেখানে বসা। পোষাক দেখিয়া বুঝা যায় সকলেই মুসলমান। দুই জনের বয়স একটু বেশি, তাহারা বাদে অন্য সবাই যুবক। প্রবীণ দুইজনের একজনকে কামাল চেনে, তাহার নাম মহম্মদ ইউনুস ; স্থানীয় আদালতের

উকিল। গোঁড়া সাম্প্রদায়িক বলিয়া তাহার কুখ্যাতি বা খ্যাতি আছে।

তিনি তখন বলিতেছিলেন,—আপনি তাহলে জাতির বিরুদ্ধে যাবেন?

কামালের বাবাকে দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল তিনি শারীরিক অসুস্থ। কথা বলিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেছেন না। করুণ চোখে তাহাদের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—বললুম তো, জাতি কাকে বলছেন আপনি! খেয়াল খুশিতে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একদল মুসলমান যদি একটা দল গড়েই থাকে, তাকে যে আমারো সমর্থন করতে হবে, তার কী মানে আছে? আমি কী নিজে কোনো স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারবোনা?

উকিল সাহেব বলিলেন,—কিন্তু আপনি যে ভাবে কথা বলছেন, তা আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে বলে মনে করি।

—তাহলে আমি নাচার। কিন্তু আমি জানি, আমি যা বলছি সবই ন্যায়সংগত!—বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু পড়িল কামালের দিকে—অত্যন্ত আগ্রহ, কৌতূহল ও বিস্ময় লইয়া সে সব কথা শুনিতেছে।

কামাল ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাবাকে সে যতোখানি শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, অতোখানি শ্রদ্ধাপ্রীতি বোধ হয় সে আর কাহাকেও দেয় নাই। অতি ছোটবেলা হইতেই বাবার দেবতুল্য চরিত্র নব নব মুগ্ধতায় তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে।—তাঁহার সকল কার্য, সকল

কথাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া নিতে কখনই তাহার দ্বিধা হয় নাই। তিনি যাহা করেন ও বলেন সবই ঠিক, এই রকম একটা বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল। তাই বাবার নিকট ঘেঁষিয়া, আগন্তুকদের প্রতি কেমন একটা বিদ্বেষ দৃষ্টি লইয়াই সে দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু রহমান সাহেব তাহাকে আদেশ করিলেন,—যাও, তুমি বাড়ির মধ্যে যাও কামাল।

কামালের যাইতে ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু রহমান সাহেব আবার যখন বলিলেন,—যাও। তখন বাধ্য হইয়াই তাহাকে ক্ষুণ্নমনে চলিয়া আসিতে হইল।

তাহার দিদি শামিম তখনো কান পাতিয়া বেড়ার কাছে দাঁড়াইয়া। কামালও তাহার কাছে দাঁড়াইয়া ভিতরের কথা শুনিতে লাগিল।

—তাহলে আপনি আমাদের মেম্বার হবেন না?

—জ্বী না।

—বেশ! কিন্তু কওমের (জাতির) বিরুদ্ধে যাওয়াটা মোনাফেকি (অধর্ম) হবে না?

রহমান সাহেব অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম হয়তো আপনিই তা ভালো করে জানেন না।

—তার মানে?

—তার মানে পরিস্কার! তুচ্ছ তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে এক

সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগুক, দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৈষম্য বেড়ে উঠুক, এইটাই আপনি চাইছেন। আপনি এতোক্ষণ ধরে আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে হিন্দুদের অন্যায়ের ফলেই বাংলাদেশের মুসলমানেরা এতো দারিদ্র্য এবং অভাব-অনটনের মধ্যে পড়ে রয়েছে। কিন্তু সে কথা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা ইতিপূর্বে বিশদভাবে আপনাকে বলেছি। আজ যে কারণে আমাদের—মানে কেবল মুসলমানদেরি নয়, সকলের দুরবস্থা—তার প্রতিকারের উপায় অন্য—এবং সে কারণ দূর করতে যদি আপনারা সত্যি সত্যি সচেতন হতেন, তাহলে নিশ্চয় আমি আপনাদের সমর্থন করতুম। কিন্তু আমার মনে হয়, আপনারা ভুল করছেন, আপনাদের কার্যে শুধু হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটাই বেড়ে উঠবে। সেটা কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। আপনারা চিন্তা করছেন শুধু মুসলমানদের নিয়ে, কিন্তু এতোবড়ো বিরাট দেশে অন্যান্য সম্প্রদায়ও রয়েছে—তাদের কথাটাও আপনাকে বিবেচনা করে দেখতে হবে—কারণ আমরা একই দেশের অধিবাসী, সমান সুখ-দুঃখে, আর্থিক দুরবস্থায়—

—আচ্ছা আচ্ছা যাক, আপনার বক্তৃতা শুনতে আমরা আসিনি।—উকিলসাহেব হঠাৎ বাধা দিয়া দলবল সহ উঠিয়া পড়িলেন।

খানিকক্ষণ রহমান সাহেবের কোনো কথা শোনা গেল না, তার পর কামাল অনুমান করিতে পারিল, তিনি হাসিয়া ধীর

স্বরে বলিতেছেন,—কিন্তু আমিও তো আপনাদের ডাকিনি। একটু পরে 'ইউনুস সাহেবের ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—হিন্দুদের পা-চাটা একদল মুসলমান আছে, যদিও তারা সংখ্যায় দু'-একজন, তাদের আমরা মীরজাফর বলি। তা আপনিও যে সেই দলের, তা জানতুম না।

—আমার দুর্ভাগ্য! জানেন না তার কারণ সত্যি কে মীরজাফর, তা চেনার মতো চোখ আপনাদের নেই।

হঠাৎ কেশে উঠলেন রহমান সাহেব।—আমাকে মাপ করবেন, আমি আজ অসুস্থ। বেশি কথা কইতে পারছি না। আপনারা বরং আরেকদিন এলে—

—তার দরকার হবে না। আপনাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু যাবার সময় আপনাকে সাবধান করে যাই, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আপনার যোগ না দেওয়ার অর্থ বিরোধিতা করা, যার ফল খুব ভালো হবে না!

বাকবিতণ্ডার স্বর ক্রমান্বয়ে উচ্চতর হইতেছে শুনিয়া কামাল এক প্রকার অজ্ঞানেই আবার বৈঠকখানার দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেখিল, উকিল সাহেব চক্ষু গরম করিয়া তাহার পিতাকে শাসাইয়া দলবল সহ চলিয়া গেলেন।

রহমান সাহেব করুণ বিষণ্ণ চোখে তাহাদের গমন পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার স্তব্ধমূর্তি দেখিয়া কাছে যাইতে সাহস করিল না কামাল; দিদির কাছে ফিরিয়া আসিয়া

আবার জিজ্ঞাসা করিল,—কারা ঐ লোকগুলো দিদি, কেন এসেছিলো ?

—কারা কী জানি। বাবাকে ওদের দলে নিতে চেয়েছিলো।

—কেন ? কোন দলে ?

—হিন্দুরা নাকি মুসলমানদের সব জায়গায় ঠকাচ্ছে, তাই ওরা মুসলমানদের একটা দল গড়েছে। সেই দলে।—শামিম ঘরের মধ্যে যাইতে যাইতে কহিল।

—কেমন করে ঠকাচ্ছে দিদি ?

—কোথায় ঠকাচ্ছে ? বুদ্ধির দোষে যারা নিজেরা ঠকে, তাদের ঠকাবার জন্য লোক দরকার হয় ? ওরা মনে করছে মুসলমানদের আজ যে এই দুরবস্থা, তার কারণ, হিন্দুরা ঠকিয়েছে তাদের। কিন্তু আসল কথা তা নয়। বড়ো হ, ধীরে ধীরে সব বুঝতে পারবি—এখন তোর এসব ভেবে কাজ নেই।

শামিম প্রসংগ চাপা দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেল।

কিন্তু কামালের কৌতূহল মেটেনা। কিছুতেই সে মন হইতে উহার চিন্তা দূর করিতে পারে না। এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে বৈঠকখানা ঘরে উঁকি দিয়া দেখিল, তাহার বাবা তখনো সেই অবস্থায় বসিয়া আছেন। গভীর বিষাদে তাহার সারা মুখ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরে সন্ধ্যা নামিল, ঘর অন্ধকার হইয়া আসিল, সেদিকে তাহার কোন খেয়াল নাই।

কামাল আবার সরিয়া আসিয়া ইতিপূর্বে শোনা কথাগুলি বারবার অনুধাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাহিরে তখন নিঃশব্দে রাত্রি নামিয়াছে। পাশের বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আলো জ্বালাইয়া ঘ্যানোর ঘ্যানোর করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। পথের অপর পার্শ্বে দোতালা দালানটির প্রত্যেক কক্ষে বিদ্যুতের আলো ঝলমল করিয়া উঠিল।

কামাল বৈঠকখানার দরজার ধারে দাঁড়াইয়া তখনো ঐ কথাগুলি লইয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করিতেছে।

অবশেষে সে বহু ভাবিয়া স্থির করিল, লোকগুলি কোনো-ক্রমেই তাহাদের দলগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্ভুল নয়।

তাহার মা বৈঠকখানায় আলো দিতে যাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে থামিলেন,—একী, তুই এখনো এখানে বসে? হাত পা ধুয়ে পড়তে বসগে যা।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া কামাল তাহাকে আবার বলিতে শুনিল—ওমা, তুমিও যে বসে রয়েছো এখানে! ব্যাপারটা কী পাল্লা দিয়ে ধ্যানে বসেছো নাকি আজ?

হ্যারিকেনটা টেবিলে রাখিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—লোকগুলোর সংগে ঝগড়া করলে বলে মনে হোলো যেন?

—তারা জোর করে ঝগড়া করলে কী করবো বলো!

মুসলমানদের জন্য কী একটা দল গড়েছে ওরা—তার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের নায্য দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করবে, মুসলমানদের দুঃখকষ্ট দূর করবে—এই সব। আমাকে বলে ছিলো সভ্য হতে। আমি বললাম—ন্যায্য মতো দুঃখকষ্ট দূর করবার উদ্দেশ্যই যদি থাকে তাহলে, সেজন্য অন্য প্রতিষ্ঠান তো রয়েছে। এর প্রয়োজন কী? তাছাড়া, যেরকম করে তারা দল গড়তে চাইছে, তাতে মনে হোলো তাতে করে হিন্দু মুসলমানের গণ্ডগোল ঘটবে, তাই সমর্থন করতে পারলুম না। দুঃখকষ্ট আছে হিন্দু মুসলমান উভয়েরি—দলাদলি না করে সবাই মিলে তা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। আমি সে দলাদলিকে সমর্থন করলুমনা বলে শাসিয়ে গেলো!

সমস্ত কথাবার্তাগুলি ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হইয়া আসিল কামালের কাছে। পিতার দৃঢ়তাকে সমর্থন ও তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু রহমান সাহেব ছাড়া আর কেহই বোধ হয় বুঝিতে পারিলনা, যে আজিকার এই বচসাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার সম্মুখে এক দুর্ঘটনার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে!

প্রায় পঞ্চাশজন সভ্য লইয়া সবুজ-সংঘ গঠিত হইল। দিবাকর বাবুকে সভাপতি ও বরুণকে সম্পাদক করিয়া কার্য-নির্বাহক একটি সমিতিও করা হইল। লাইব্রেরী ও আনুসংগিক

অন্যান্য কার্যের জন্য বরুণদেরই বাড়ির নিচের তলার একটি ছোট ঘর পাওয়া গেল।

বরুণ এবং অন্যান্য উৎসাহী সভ্যদের উদ্যোগে উদ্বোধন দিনে শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য লোক ও শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করা হইল। উদ্বোধনের জন্য অনুরোধ করা হইল সমাজ-সংস্কারী ও সাহিত্যিক খ্যাতিসম্পন্না একজন বিদুষী মহিলাকে। সকল ব্যবস্থাই দিবাকর বাবুর পরামর্শ লইয়া তাহারা করিল। তিনি পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের যতোটুকু সাহায্য করার করিতে লাগিলেন। সবুজ-সংঘের সমস্ত উৎসাহী সভ্যরা ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হইতে শুরু করিয়া, দিবাকর-বাবুর রচিত একটি ছোট নাটিকা পর্যন্ত অভিনয়ের আয়োজন করিয়া ফেলিল।

অনুষ্ঠানের দিন সকলেই খুব ভোর হইতেই নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইল। সুন্দর সকাল বেলা। সবুজসংঘের ছোট ঘরটিতে শুভ্র ফরাস বিছানো। ইতস্ততঃ ফুলের স্তবক সাজানো। দেয়ালে বিভিন্ন রঙের কালিতে লেখা সবুজসংঘের আদর্শের কথা সমন্বিত প্রাচীর পত্র। সবুজ সংঘেরি অন্যতম সদস্য রজত নিজের হাতে সব সাজাইল। ইহা ব্যতীত ঘরের চারি কোণে রহিল মহাপুরুষদের মৃণ্ময় মূর্তি। সর্বত্রই এক শুচি স্নিগ্ধ পবিত্রতা।

যথাসময়ে উপস্থিত সকলের ললাটে চন্দন তিলক আঁকিয়া অনুষ্ঠান সুরু হইল। দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্বে সভানেত্রী সমাগত সকলের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বলিলেন—

যতোটুকু জানিয়াছি, তোমাদের উদ্দেশ্য অতীব শুভ ও সাধু। অন্তরের সকল মালিন্য ও সংকীর্ণতা দূর করিয়া মনুষ্যত্বকে বিকশিত করিবার শুভ ব্রত তোমরা গ্রহণ করিয়াছ, আজ এই সংঘের দ্বার উদঘাটনের সংগে সংগে তোমাদের অন্তরের দ্বারও উদ্‌ঘাটিত হউক—মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তোমাদের অন্তর দীক্ষালাভ করুক।

সকলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। সবিতা তাহার মধুর কণ্ঠে 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গাহিয়া অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করিল।

এইবার সবুজ-সংঘের আদর্শ ও সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর পরামর্শ লইয়া বিভিন্ন আলোচনা। বরুণ সংক্ষেপে তাহাদের মিলিত আদর্শ ও নিয়মাবলী পাঠ করিল। অবশেষে সভানেত্রীর আহ্বানে বিভিন্ন অতিথিরা সংঘের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে নানা কথা আলোচনা করিলেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর কথাগুলি বলিলেন বরুণের পিতা। তিনি কহিলেন, তোমাদের—এইসব সবুজদের উদ্যম দেখে আমরা আশাতীত প্রীতিলাভ করলাম। আজ তোমাদের এইখানে এরচেয়ে বড়ো কথা বলার আর কিছু নেই। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি! কোথায় কিছু বলতে গেলেই সেসব কথা 'উপদেশ' হয়ে পড়ে, কেমনা বয়স বেড়ে গেলেই উপদেশ দেবার একটা ঝোঁক আসে। কিন্তু আমরা যা করতে পারিনি, তাই করবার জন্য তোমরা যখন পণ করে এই সংঘ স্থাপন করেছো, সে সময়

আমার যথাসাধ্য তোমাদের সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েকটি কথা তোমাদের বলি।

তোমরা জানো—আমাদের দেশ আজ নানা দুঃখ, দারিদ্র্য রোগে—শোকে প্রপীড়িত। সোনার বাংলা কেন এরকম হোলো সেকথা বড়ো হলে তোমরা বুঝতে পারবে। কিন্তু বর্তমানে—সোনার বাংলার এই ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে কী করা প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তোমরা এখন থেকেই ভাবতে শেখো। তোমাদের কাছে এই কথাটুকু বলেই আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাদের আশীর্বাদ করছি। আমরা আশাও করি যে তোমরাই একদিন এই দেশের দুঃখ ঘোচাতে সমর্থ হবে। মহান তোমাদের ব্রত। যে পথে চলার সংকল্প আজ নিয়েছো, তার জন্য পাথেয় হোক তোমাদের সুস্থ সবল জীবন। মনে রেখো কবিগুরুর কথা—

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।

ইহার পর দিবাকরবাবুর 'সবুজ-কিশোর' নামক নাটকের অভিনয়। তরুণ কিশোরদল সমস্ত প্রকার অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, মরা দেশে জীবন জাগাইয়া, সকল-প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সত্য, সুন্দর

ও পবিত্র মনুষ্যত্বের পতাকা উড্ডীন করিল, ইহাই তাহার বিষয়বস্তু।

নাটকের অভিনয় দেখিয়া সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রায়বাহাদুর চুনীলাল চৌধুরী, যিনি শহরের একজন শ্রেষ্ঠ ধনী, এবং বরুণ প্রভৃতিরা যে স্কুলে পড়ে, সেই চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন এর মালিক, যিনি অত্যন্ত গম্ভীর, সংযত প্রকৃতির মানুষ, এবং শহরের অধিকাংশ লোকই যাঁহাকে অপছন্দ করে সেই রায় বাহাদুরও উৎসাহিত হইয়া সেরা অভিনেতাকে একটা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন।

অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হইবার পূর্বে সভানেত্রী সমাগত কয়েকটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করিয়া,কহিলেন,—তোমরাও পিছিয়ে থেকো না। তোমাদের ভাইয়েরা যে সংকল্প নিয়েছে তাতে তোমরাও সুর মেলাও। তোমরা ভাইবোনেরা একত্র হয়ে যদি সামান্য-তম কল্যাণের কাজও করতে পারো, তাহলে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের পথে তা ভিত্তিস্বরূপ হয়ে উঠবে।

উপস্থিত অনেকেই সেকথা সমর্থন করিলেন। সবিতা ও তাহার কয়েকটি বন্ধু উৎসাহিত হইয়া ঘোষণা করিল,—অবিলম্বে তাহারও সবুজসংঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সাধ্যমতো কর্মে অবতীর্ণ হইবে।

অনুষ্ঠান শেষে তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া শহরের কয়েকটি প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিল।

শোভাযাত্রার পর শ্রান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বরুণ

কহিল,—এখন আর তোর বাসায় যেয়ে কাজ নেই কামাল, বরং আয় আজ আমার সংগে খেয়ে যাবি।

বেলা তখন প্রায় একটার কাছাকাছি। রৌদ্রে ঘুরিয়া সে সত্যই ক্লান্তি অনুভব করিতেছিল। বরুণের প্রস্তাবে প্রথমটা একটু বিব্রত হইলেও, পরে তাহার পীড়াপীড়ি দেখিয়া আর বিশেষ আপত্তি করিলনা।

— সত্যি ভাই, তোর সংগে বসে আজ একসাথে খাবো, এতে আপত্তি করিস নে।

—বেশ।

বৈকাল তিনটায় কামাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। মা দিদি দুইজনেরই ক্রুদ্ধ প্রশ্ন,—কোথায় ছিলিরে এতোক্ষণ? আমরা এদিকে ভেবে হয়রান!

কামালের মুখে সব কথা শুনিয়া মা আর রাগ করিলেন না।—কিন্তু তবু একটা খবর দেওয়া তোর উচিত ছিল। —তা ছেলেটিকে বাড়িতে নিয়ে আসিস না একদিন।

—দূর! সে কতো বড়লোক,—আমাদের এই নোংরা গরীবের ঘর দেখে ভাববে কী!

মা সবিস্ময়ে কামালের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কেন, গরীবদের সে ঘৃণা করে নাকি?

কামাল তাড়াতাড়ি কহিল,—না, ঠিক তা নয়—আমি

বলছিলাম—কিন্তু কথাটা সে শেষ করিল না। শামিম কহিল,—আমাদের গরীব-ঘরে এসে যদি তার অসুবিধাই হয়, তবে তার সংগে তোর বন্ধুতা করেও কাজ নেই! গরীব হলেই মানুষ হীন হয়ে যায় না।

কামাল বলিল,—না, না আমি সেকথা বলছিনে, তার মনে সে রকম কোন অহংকার নেই। তবে, আমাদের এই সব আধভাঙা ঘরদোরে তাকে আনতে বলতে লজ্জা করবে না?

মা বলিলেন,—যা সত্য, তার জন্য কোনো লজ্জা না করাই উচিত।

—আচ্ছা, তাহলে সত্যি একদিন তাকে নিয়ে আসবো। দেখো মা, সে কী চমৎকার ছেলে! জানো দিদি, স্কুলে সে সব চাইতে—

কামাল বন্ধুর গুণ বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় রক্তাক্ত মস্তক রহমান সাহেবকে লইয়া একজন আগন্তুক যুবক ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই তাহার রক্তাক্ত দেহ দেখিয়া অস্ফুট চিৎকার করিয়া কাছে আগাইয়া গেল।

কামালের মা কাঁদিয়া উঠিলেন—ওগো একী! কী হোলো?

রহমান সাহেবের মাথায় ব্যাণ্ডেজ। বেশবাস ধূলিধূসরিত, ছিন্ন এবং রক্তাক্ত। হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া তিনি যুবকটির স্কন্ধে ভর দিয়া শোবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

অপরিচিত যুবকটি মুখ ফিরাইয়া কহিল,—ব্যস্ত হবেন না। কোনো ভয়ের কারণ নেই। সব বলছি।

খাটের বিছানায় তাহাকে শোয়াইয়া পকেট হইতে কতকগুলি ওষুধের শিশি বাহির করিয়া মা'র হাতে দিয়া সে কহিল,—গুণ্ডারা লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়েছে। না, না, ভয়ের কোনো কারণ নেই!

কামালের মা স্বামীর কাছে বসিয়া ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শত্রুতা নেই কারো সংগে তবু কেন এমন করে লাঠি মারলো?

যুবকটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—তাহলে গোড়া থেকে শুনুন। আমরা কয়েকটি মুসলমান ছাত্র মিলে একটা সভা ডেকেছিলাম—দেশের দুর্দিনে আমরা কী করতে পারি তাই আলোচনা করার জন্য। সেখানে ওঁকে আমন্ত্রণ করে-ছিলাম। উনি ওঁর বক্তৃতায় ইউনুস সাহেবদের সমিতির একটু সমালোচনা করতেই তার দলের লোক গণ্ডগোল করে সভা পণ্ড করে দেয়। তার আগে থেকেই তারা নানা উপদ্রব সুরু করেছিলো যাতে সভা না হতে পারে। সে যাক্, সভার শেষে উনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন, এই সময় হঠাৎ তাকে কতকগুলো লোক আক্রমণ করে মাথায় ডাণ্ডা মারে। আমরা খবর পেয়ে ছুটে যেয়ে দেখি উনি রাস্তায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন—আর শয়তানগুলো কেউ কোথাও নেই। তারপর ধরাধরি করে কাছের ডাক্তারখানায় নিয়ে

গেলাম। আমাদের দলের লোক তো ইউনুস উকিলের বাড়িতে যেয়ে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য ক্ষেপে উঠে ছিলো—উনি মানা না করলে বেশ মারামারি হয়ে যেতো আজ।

ডাক্তারের উপদেশগুলি বুঝাইয়া যুবকটি, আনোয়ার তাহার নাম—বিদায় গ্রহণ করিল।

রহমান সাহেব কী চিন্তা করিতেছিলেন। কামালের মা ক্রন্দনের সুরে কহিলেন,—কেন গিয়েছিলে তুমি ওদের সাথে সভা করতে—হয়তো ওদের সাথে কোনো বিবাদ আছে, তাই তোমার উপর দিয়ে ঝাল মিটিয়ে নিলো।—

রহমান সাহেব শ্রান্ত করুণ দুইটি চক্ষু তাহার দিকে ফিরাইয়া কহিলেন,—না, না—ওদের কোনো দোষ নেই। ওদের সাথেই কেবল তাদের বিবাদ নয়। বুদ্ধিমান বিবেকী মাত্রেই তাদের শত্রু। তাছাড়া সত্য বলে যাকে জানি, কেন তা বলবো না?

—কিন্তু তার ফল তো এই!

—না, এটা ফল নয়। বাধা। সত্যের পথে বাধা দিলেই কী সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে?

রহমান সাহেব মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিলেন। শামিম কামাল সকলেরই মুখে একটা ভয় ব্যাকুল স্তব্ধতা। কিন্তু এই উক্তিটি উচ্চারণ করিবার সংগে সংগে তাহার মুখে যে পাণ্ডুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে হাসি দেখিয়া কামাল যে কেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল তাহা সে-ই জানে।

রহমান সাহেব আবার বলিতেছিলেন,—বেশির ভাগ মুসলমানই তার দলে। কিন্তু স্বার্থের খাতিরে তারা যে পথ অবলম্বন করছে, একদিন তা ভুল বলে ওরা উপলব্ধি করবেই। শুধু আমাকে নয়, দেশের আরো অনেক লোককে তারা নিগৃহীত করেছে কিন্তু তাতে কী সত্যের আদর্শ মুছে যায়? অন্তরে যাকে সত্য বলে বুঝেছি, তা আমি বলবোই—

কামাল একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। রহমান সাহেবের মাথার চুল নিম্নাংশে পাকা। তাহার উপর দিয়া মাথায় ব্যাণ্ডেজ। রক্তস্নাত সুন্দর গৌরবর্ণের মুখে তাঁহার সেই করুণ হাসি যেন তাঁহাকে আরো সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিয়াছে। কামাল শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁহার তেজস্বি-তাকে মনে মনে প্রণাম করিল।

রহমান সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—কামাল, শামিম ওরা কোথায়?

—এই তো। কাছে যা কামাল।

কামাল তাহার বাবার কাছে উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল। ফুঁপাইতে লাগিল তাহার বুকের উপর মুখ রাখিয়া।

রহমান সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—এ কী রে পাগল! কাঁদছিস কেন? কী

হয়েছে আমার! কিচ্ছু হয়নি, দেখিস কালই আবার বুক ফুলিয়ে গট গট করে হাঁটবো। শোন, তোদের সভা হয়েছিলো? আমি যেতে পারলুম না, ওই ছেলেরা এসে ধরে পড়লো, তাদের কথা শুনতে শুনতে দেখি, তোদের ওখানে যাবার আর সময় নেই!—

শামিম কহিল,—থাক বাবা, তুমি অতো কথা বোলো না, তোমার কষ্ট হচ্ছে!—

রহমান সাহেব হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন।

নির্দিষ্ট কর্মসূচী লইয়া সবুজ-সংঘ নানাকার্যে অবতীর্ণ হইল। পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া ডোবা ভরাট, জংগল সাফ, —বস্তীতে বস্তীতে ঘুরিয়া বস্তীবাসীদের নানা হিতসাধন এবং রবিবার তাহাদের সামান্য ভাষাজ্ঞান দানের বন্দোবস্ত; আর ইহা ব্যতীত একটি সেবা-বাহিনী গঠন করা হইল, যাহারা অসহায় বস্তীবাসীদের রোগে সাধ্যমতো সাহায্য শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল।

কামাল তাহার আর পাঁচজন সংগীসহ একটা বস্তীতে নিরক্ষরতা দূর করার ভার পাইল। বস্তীটার মালিক

রায় বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরী। রিক্সাওয়ালা, মুটে, মজুর, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি প্রায় দুইশত পরিবার সেখানে থাকে। যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যোপযোগী তো নয়ই, বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাসম্পন্ন সুস্থ মানুষ তাহার ত্রিসীমানায় আসিতেও ভয় পাইবে। কামাল এতদিন ভাবিত, তাহারাই গরিব, কিন্তু এইখানে যাহাদের দেখিল, তাহাদের জীবন ধারণের দুঃসহতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সমস্ত ধারণা উল্টাইয়া গেল।

ঠাসাঠাসি করিয়া নোংরা ছোট ছোট ঘরে ইহারা স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। রান্না, খাওয়া, শোওয়া সবই ঐ ভাঙা চালওয়ালা ছোট খোপের মধ্যে। বর্ষায় উপর হইতে জল পড়িয়া মেঝে ভাসিয়া যায়। সম্মুখে, চতুর্দিকে নোংরা আবর্জনা জমিয়া উৎকট গন্ধ ছড়ায়। দুয়ার নাই কোনো ঘরের। হোগলার ঝাপ অথবা ছেঁড়া চট ঝুলাইয়া ঘর ও বাহিরকে পৃথক করা। ইহার মধ্যে শতছিন্ন পোষাকে, দারিদ্র্যকাতর যে দেহগুলি বাস করে তাহারা সকাল সন্ধ্যা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহা দ্বারা সকলের দুইবেলা পেট পুরিয়া আহারও জোটাইতে পারে না —রোগে ঔষধ যোগাইতে পারে না। দুনিয়ার আনন্দ-উচ্ছলতা হঠাৎ যেন সব এইখানে আসিয়া থামিয়া গেছে। প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মুখে শুধু নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের রাজত্ব। বাহিরে, ঐ রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরীর বাড়িতেও নিয়তই যে বিলাস

উচ্ছ্বাস আনন্দ তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছে, তাহার এতটুকু চাঞ্চল্যও এইখানে আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই ছোট ক্ষুধার্ত পৃথিবীটির সবই যেন স্বতন্ত্র। দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর, বাঁচিবার আগ্রহে, নিষ্ঠুর দারিদ্রের সাথে সংগ্রাম করিয়া হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এই সব সর্বহারার দল একই ভাবে এইখানে বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের জন্ম মৃত্যু, দুঃখকষ্ট বাহিরের আনন্দ-চঞ্চল পৃথিবীকে কোনোদিন বিমর্ষ করে নাই।

সামান্য চাঁদা তুলিয়া ইহাদের সাহায্য করা বা সামান্য লেখাপড়া শিখাইয়া ইহাদের হিতসাধনের চেষ্টা হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। সমস্ত জীবনটাই যাহাদের অসীম দুঃখে সর্বশূন্য, তাহাতে ঐ চেষ্টায় কতটুকু পূর্ণতা আনা যাইবে ভাবিয়া কামাল মনে মনে অত্যন্ত দমিয়া গেল।

সংঘের সভাপতি দিবাকরবাবু। তাহার কাছে গিয়া জানাইল,—যে লোক খেতে পায়না, তাকে সামান্য অক্ষরপরিচয় করিয়ে কী লাভ হবে দিবাকর দা?

দিবাকর প্রশ্ন শুনিয়া অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিয়াছিলেন,—বই হচ্ছে জ্ঞান। পরিচয় তো শুধু অক্ষরের সাথে নয়, জ্ঞানের সংগেও। ওদের অবস্থাটা ওদের বুঝতে শেখাও।

কামাল শ্রদ্ধালুচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছিল, কোনো জবাব করে নাই।

দিবাকর আবার কহিলেন,—তোমার অসুবিধেটা আমি বুঝতে পারছি কামাল। উপস্থিত তোমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা

তো তোমাকে করতে হবে! বিফল যদি হও, আমাকে বোলো—আমি তো তোমাদের সাহায্যের জন্তেই আছি!

বরুণের মনেও এই প্রশ্নটা খুব তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে।

কামালের সাথে সে-ও এই বস্তীতে আসিত। সে যে-জগতের মানুষ, সেইখানে থাকিয়া কোনোদিন এই মতো দুঃখ কষ্টের মধ্যে জীবনধারণের কথা কল্পনা করিতেও পারে নাই। সে-ও ভাবিলঃ সবুজ-সংঘ কল্যাণসাধনের জন্য, কিন্তু তাহাদের ক্ষুদ্র সাধ্য লইয়া এই সব জীবনে কেমন করিয়া তাহারা কল্যাণ আনিবে? অথচ সর্বাপেক্ষা কল্যাণের প্রয়োজন তো ইহাদেরি! মানুষ হইয়াও যাহাদের এই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতায় উন্নত পৃথিবীর সহিত কোনো সংপর্ক নাই, মানুষ হইয়াও যাহারা পশুর তুলনায়ও অধম অবস্থায় কালাতিপাত করে—তাহাদের মনুষ্যত্বের স্তরে তুলিয়া আনিতে না পারিলে তাহাদের আদর্শের আর সার্থকতা কী? কিন্তু নিজেদের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা যে ইহাদের দুঃখ মোচন করিতে পারিবে এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখিতে না পাইয়া সে-ও অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল।

তবু, দিবাকরবাবুর উৎসাহ পাইয়া তাহারা হাল ছাড়ে নাই। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত আসিয়া কর্তব্য করিবার চেষ্টা

করিয়াছে। ঘরে ঘরে খোঁজখবর লইয়া যতোটুকু সম্ভব তাহা-দের দুঃখ দূর করার কার্যে নামিয়াছে।

সাড়াও পাইয়াছে যথেষ্ট। দীনদুঃখীর দল নিজেদের ব্যথার ব্যথী পাইয়া খুশি হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি ঘরে, প্রত্যেকের সহিত তাহাদের অন্তরের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হইতে সুরু করিয়া ছোটো বালকটি পর্যন্ত খোকাবাবুদের দেখিলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে। নিজেদের ক্ষুদ্র গৃহে তাহাদের ক্ষণেকের জন্যও বসাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া ওঠে।

প্রতি রবিবার তাহারা আসিয়া গাছতলায় ক্লাশ নেয়। বিনামূল্যে শ্লেট বই সরবরাহ করিয়া তাহাদের লেখাপড়া শেখায়। আর কখনো কখনো সবিতাও দুই একটি বন্ধু লইয়া আসিয়া তাহাদের সংগে যোগ দেয়,—ঘরে ঘরে তত্ত্বতালাশ লইয়া ছেলেমেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের সাথে বস্তীসংস্কারে লাগিয়া যায়।

সেদিন বস্তীতে আসিয়া দেখিল একটা গাছতলায় বসিয়া বস্তীবাসীরা কী একটা কাগজ লইয়া চঞ্চল হইয়া আলোচনা করিতেছে। তাহাদের দেখিয়া, একজন উঠিয়া কামালের হাতে কাগজখানা দিয়া কহিল,—পড়ুন তো খোকাবাবু!

কামাল শিলমোহর দেওয়া কাগজখানার চেহারাটা দেখিয়া লইয়া আগাগোড়া পড়িয়া গেল।

বস্তী ছাড়িয়া 'যাইবার নোটিশ। রায় বাহাদুর চুনীলাল চৌধুরী এতদ্বারা বস্তীবাসী সর্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সকলকে বস্তী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের বলপূর্বক সরাইয়া দেওয়া হইবে।

কামাল বিস্মিত হইল,—কেন? আপনারা খাজনা দেন না? বস্তীবাসীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান কেশব; বয়স ষাটের কাছাকাছি। সে আগাইয়া আসিয়া কহিল দেইনা? খাজনা দিয়েই তো আজ আট বছর এইখানে আছি! এখন যে আমাদের চলে যেতে নুটিশ দিলেন, কোথায় যাবো আমরা?

সত্যিই তো, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া কোথায় যাইবে ইহারা?

বরুণ জিজ্ঞাসা করিল,—হঠাৎ কী হোলো যার জন্য তিনি নোটিশ দিলেন?

কেশব কহিল,—বস্তীটা নাকি শহরের জঞ্জাল, তাই উঠিয়ে দেবেন। কারখানা করবেন এখানে। কীসব যন্ত্রপাতি বসবে।

কামাল ভাবিয়া দেখিল, জমি রায় বাহাদুরের। আইনের অধিকারে তিনি বস্তী উঠাইয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু ইহারা এই শহরেই নানা কাজকর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে,

এখান হইতে তাহাদের তুলিয়া দিলে কোথায় যাইয়া আবার আবাস গড়িতে পারিবে? শহরের কোথাও একটুকরা জমিও কেহ তাহাদের ছাড়িয়া দিবে না। তাহার চেয়ে বরং রায়বাহাদুরের কাছে মিনতি করিয়া—

তিনি হয়তো এখানে অট্টালিকা তুলিবেন। বস্তীটা শহরের 'জঞ্জাল'। জঞ্জালই তো। শহরের ঐ সব প্রাসাদোপম অট্টালিকার কাছে এই হতশ্রী, ভগ্ন খোলার ঘরগুলি তাহাদের চোখে অনাবশ্যকীয় আবর্জনা বলিয়া প্রতিভাত হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে। এই বস্তীর বাসিন্দাদের হাতেই যে এই শহরের জীবন চলিতেছে, তাহা তাঁহার ঐশ্বর্যবিমণ্ডিত প্রাসাদে বসিয়া, মনে না পড়াই স্বাভাবিক। সভ্যতাস্নিগ্ধ শান্ত বিলাস ও আরামের জীবন যে ইহারাই প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া চলমান রাখিতেছে, কে তাহার সন্ধান লয়?

কিন্তু, তবু এতোগুলি জীবন আজ যাইবে কোথায়! এখান হইতে ঘরবাড়ি ভাঙিয়া তুলিয়া দিলে ইহাদের উপায় কী? শহরে রায়বাহাদুরের তিন চারখানা বড়ো বড়ো বাড়ি, এখানে তেমন একখানা না তুলিলে কী ই বা এমন ক্ষতি হইবে তাহার।

কামাল বলিল,—আপনারা যেয়ে তাকে ধরে পড়লে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই কেশব কহিল,—আমরা গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনো ফল হোলো না। তার দেখাও মিললো না—ম্যানেজার এসে বললে—তিনি যা ঠিক করেছেন, তা করবেনি।

কী করা যাইবে কামাল ভাবিয়া পাইল না। বরুণকে কহিল,—তোর বাবার সংগে তো রায়বাহাদুরের আলাপ আছে, তাকে দিয়ে বলানো যায় না? আর তাছাড়া, সেদিন আমাদের সভায়ও তো উনি এসেছিলেন, আমরা যদি দল বেঁধে তার কাছে যাই, তবে কী কোনো ফল হবে বলে মনে করিস?

বরুণ চিন্তিতমুখে বলিল,—ঠিক বুঝতে পারছিনে। যা-ই করি, চল আগে দিবাকর দা'র সংগে পরামর্শ করি।

কামাল হঠাৎ যেন কূল পাইল, বলিল,—ঠিক বলেছিস। তুই যা ভাই, দিবাকর দা'কে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়। আমি এখানে রইলাম।

কিন্তু তাহাকে ডাকিতে আর যাইতে হইল না, তিনি সেদিকেই আসিতেছিলেন। সব ঘটনা শুনিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, তোমরা দুশ্চিন্তা কোরো না। এখনো তো এক সপ্তাহ সময় আছে। ধীরে সুস্থে ভেবেচিন্তে যাহয় করা যাবে।

কিন্তু বিশেষ কিছুই করা গেল না। সবুজসংঘের ছেলেরা শহরের অনেক লোক দিয়া রায়বাহাদুরের কাছে বস্তীবাসীদের পক্ষ হইয়া অনুরোধ করাইল, কিন্তু তাহাতে কোনো ফল লাভ হইল না। সকলেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—নাহে, তাকে রাজি করানো গেলোনা। তাছাড়া, মিউনিসিপালিটিও নাকি তার পক্ষে। ও বস্তী উঠে গেলে শহরের স্বাস্থ্য অনেক ফিরবে। যতো রকম রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাকি ওখান থেকেই।

কামাল ভাবিয়া অবাক হয়, এতোগুলি সর্বহারাকে আজ পথে বাহির করিয়া তাহারা শহরের স্বাস্থ্য ফিরাইবেন, কিন্তু উহাদের স্বাস্থ্য ফিরাইবার, উহাদের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য কী মিউনিসিপ্যালিটির কোনো কর্তব্যই নাই ? আজ ইহারা পরিবার পুত্র লইয়া শহর ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইলে অনাহারে উহাদের মৃত্যু অবধারিত—সে চিন্তাটাও কী কাহারও অন্তরে মমতার উদ্রেক করিতেছেনা ? বস্তীটাই যদি শহরের অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে সংস্কার করো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, মানুষগুলির মুখে দুইবেলা অন্ন জোগাইবার ব্যবস্থা করিয়া উন্নত করিয়া তোলো।

কিন্তু আসল গলদ সেইখানে নয়। রায়বাহাদুরের আসল প্রয়োজন ঐশ্বর্যবৃদ্ধির। তাহারই জন্য আজ বস্তী উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সবুজসংঘ কখনই তাঁহার ঐশ্বর্য বৃদ্ধিচ্ছলে এতোগুলি পরিবারকে নিরাশ্রয় হইতে দিবেনা। শেষ সাধ্যটুকু পর্যন্ত বস্তীবাসীদের পক্ষ লইয়া তাহারা সংগ্রাম করিবে। সবুজসংঘের ছেলেমেয়েরা একত্র হইয়া আলোচনা করিয়া স্থির করিল—সংঘের পক্ষ হইতে রায়বাহাদুরকে পুনর্বার অনুরোধ করা হইবে।

রায়বাহাদুরের পুত্র পান্নালাল এবং কন্যা মণিকা দুইজনেই সংঘের সভ্য। সভ্যদের পীড়াপীড়িতে তাহারা অংগিকার দিল —সংঘের পক্ষ হইয়া তাহারাও পিতার নিকট এই অনুরোধ জ্ঞাপন করিবে। সকলে উৎফুল্লচিত্তে তাহাদের অভিনন্দিত করিল।

কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। সংঘের মনোনীত প্রতিনিধিরা রায়বাহাদুরের সংগে দেখাই করিতে পারিল না।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনায় রায়বাহাদুরের সংকল্প আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল। বস্তীর ইয়াসিন অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। রায়বাহাদুরের ম্যানেজার সেদিন তাহার কাছে খাজনা চাহিতে গেলে বচসা বাধে এবং কথায় কথায় সে রায় বাহাদুরের উদ্দেশ্যে গালি দিয়া উঠে।

ম্যানেজারটি অত্যন্ত কুটিল লোক। বস্তীবাসীদের কখনো 'তুই' ছাড়া সম্বোধন করে না,—মানুষ বলিয়া তো গণ্য করেই না। বস্তীর কেহই তাহাকে ভালো চোখে দেখেনা। তাই ইয়াসিনের সংগে যখন ঝগড়া বাধিল বস্তীবাসীরা সকলেই ইয়াসিনের পক্ষ সমর্থন করিল। এবং ম্যানেজারের উন্মত্ত গালাগালিতে উত্তেজিত হইয়া তাহাকে প্রায় আক্রমণ করিয়াছিল, এমন সময় দিবাকরবাবু যাইয়া পড়ায় সে বেচারা রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ঘটনাটা যথেষ্ট রঙ মাখানো অবস্থায় সে রায়বাহাদুরকে জানাইল।

ম্যানেজার রায়বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং কীরকম আত্মীয়। সকলে শুনিল, তাঁহার এই অপমানে, বস্তী উঠাইয়া দিবার সংকল্প এইবার নাকি তাঁহার জিদে পরিণত হইয়াছে।

বস্তী ছাড়িয়া দিবার সেদিন শেষ তারিখ। সকাল হইতে দারোয়ান মারফৎ দুই দুইবার তাগিদ আসিয়াছে; শেষ বার জানাইয়া গিয়াছে, বেলা চারিটার মধ্যে বস্তী খালি করিয়া না দিলে বল প্রয়োগ করিয়া তাহাদের যাইতে বাধ্য করা হইবে। সকাল হইতে সবুজ-সংঘের ছেলেমেয়েরা আসিয়া বস্তীতে জমায়েত হইতেছে। কর্মগুণে সবুজ-সংঘ ইতিমধ্যে শহরের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিয়াছে। হু হু করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে সভ্যসংখ্যা। শহরের ছেলেমেয়েরা সহজেই আজ সবুজ-সংঘের ডাক শুনিয়া ছুটিয়া আসে। যে যতোটুকু পারে উৎসাহ উদ্দীপনা লইয়া সংঘের কার্যে সহায়তা করে।

রায়বাহাদুর চুণীলাল চৌধুরীকে শহরের কেহই পছন্দ করিত না। এই গর্বিত স্বভাব ধনীর সংগে কাহারও খাপ খাইত না। সুতরাং বস্তীর ব্যাপারটা যখন ছড়াইয়া পড়িল, কিছু কিছু জনসাধারণও আসিয়া বস্তীবাসীদের পক্ষ যোগ দিল।

সংঘের সভ্যরা ঠিক করিয়াছিল, অন্য কোনো উপায়েই যখন রায়বাহাদুরকে সংকল্পচ্যুত করা গেল না,তখন জোর করিয়া বস্তীবাসীদের উঠাইয়া দিতে আসিলে তাহারা পথ অবরোধ করিবে; শেষবারের মতো রায়বাহাদুরকে অনুনয় জানাইয়া ক্ষান্ত হইতে বলিবে। আশা এই, উপস্থিত সকলের দাবিকে কিছুতেই তিনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। তাই বস্তীর প্রবেশ পথে সকলে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শহরের প্রায় সমস্ত ছেলেরা সবুজ-সংঘের সভ্যদের সহযোগিতায় ছুটিয়া আসিতেছে। বরুণ, কামাল নানা নির্দেশ দিয়া সকলকে বস্তীর সংস্কারকার্যে লাগাইয়া দিল। সমবেত সকলের চেষ্টায় বেলা তিনটার মধ্যে বস্তীর রূপই সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। মাঝখানে একটি ডোবা ছিল, আবর্জনা দ্বারা তাহা ভরাট করিয়া ফেলিল, অধিকন্তু সকলে স্থির করিল —বস্তীবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য যে উপায়ে হউক, একটা নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছেলেদের এবং জনসাধারণের সহানুভূতি পাইয়া কেশবরাও প্রাণে বল পাইয়া জোর করিয়া কহিল,—মালিক আমাদের রাজা। তার পায়ে ধরে কেঁদে পড়বো মোরা। তবুও কী তার মন গলবেনা! মালিক না আসা পর্যন্ত এ বস্তীর এক চুল জমি ছেড়েও আমরা যাবোনা। আমাদের মনে আছে বাবু, এই মালিকই একদিন খুশি মনে আমাদের এইখানে থাকতে দিয়েছিলেন। তারপর ঐ ম্যানেজারটা আসা ইস্তকই বাবু বদলে গেছে। ওর পরামর্শে মালিক আজ বড়োলোক—মায় রায়বাহাদুর তক হোলো সত্যি, কিন্তু অন্তর থেকে দয়ামায়া ক্রমেই যেন সব কমে আসছে।—

কেশব আরো কহিল,—জানেন খোকাবাবু, ঐ ম্যানেজারটা আসার আগে আমাদের কোনো খাজনা দিতে হয়নি। ও ব্যাটা কোথা থেকে এসেই তো সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে—

একসময় সবিতা আসিয়া কামালকে বলিল,—জানো কামালদা, পান্নালাল আর মণিকা এসেছিলো, আমায় ডেকে খুব দুঃখ করে বললে—বাবাকে আমরা ভাই বাঘের মতো ভয় করি। যদি জানতে পারেন আজ তোমাদের সংগে এইখানে এসেছি তাহলে আর আস্ত রাখবেন না। তুমি ওদের কাউকে কিছু মনে করতে বারণ কোরো। আমরা তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারলাম না বলে সত্যি খুব দুঃখ পেলাম ভাই।

কামাল হাসিয়া কহিল,—বেচারিরা হয়তো ভাবছে, আমরা সবাই ওদের বাবার বিরুদ্ধে লেগেছি! কিন্তু এখন সত্যি সত্যি তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, অন্যায় যা কিছু করিয়েছে ঐ ম্যানেজারটা।

বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়া গেছে। ছেলেরা অনেকেই পরিশ্রান্ত। এমন সময় দলবল লইয়া ম্যানেজারকে আসিতে দেখা গেল।

সকলে তাড়াতাড়ি তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

ম্যানেজারের সংগে পাঁচসাতজন পাইক পেয়াদা। শাসানি-মতো তাহারা যে দখল লইতেই আসিতেছে বুঝিতে কাহারও বিলম্ব ঘটিলনা। ম্যানেজার ছেলেদের সম্মুখীন হইয়া হুংকার দিয়া উঠিল,—পথ ছাড়ো!

—না।

ম্যানেজার পিছাইয়া সাশ্চর্যে প্রশ্ন করিল,—না! তার মানে?

ম্যানেজারের পরণে সাহেবী পোষাক। সর্বাংগ ফিট ফাট। অন্তর প্রবিষ্ট সূচালো চক্ষু দুইটি তাহার প্রশ্নের সংগে সংগে যেন জ্বলিয়া উঠিল।

ছেলেরা শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন যেতে চাইছেন আগে বলুন।

ম্যানেজার রোষদীপ্ত চক্ষুতে খানিকক্ষণ তাহাদের দেখিয়া লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিল,—সে কৈফিয়ৎ তোমাদের কাছে দিতে হবে নাকি? আমার খুশি আমি যাবো।

—না, তা যেতে পারবেন না। আমরা জানি আপনি কেন যেতে চাইছেন—কিন্তু—

ম্যানেজার রাগে ফুলিতেছিল, কথার মাঝখানেই ধমকাইয়া উঠিল,—থাম ডেঁপো ছোকরা! রায়বাহাদুরের জমি, তিনি যাইচ্ছে করবেন। তোরা এখানে কি করতে এসেছিস?

বরুণ অপমান হজম করিয়া কহিল,—আমরা জানি জমিটা রায়বাহাদুরের এবং তিনি যা-ইচ্ছে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যখন এখানে আসতে পারেন, আমরা এখানকার লোকদের বন্ধু হয়ে কেন আসতে পারবোনা?—

ম্যানেজারের মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল,—ঝাঁ করিয়া বরুণের গালে এক চড় কষাইয়া বলিয়া উঠিল,—ইয়ারকী দিচ্ছিস?

ছেলেরা তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হইয়া ম্যানেজারের আচরণের প্রতিবাদ জানাইল। বরুণ চড় খাইয়া একমূহূর্ত স্তম্ভিত

হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর উত্তেজিত ছেলেদের শান্ত হইতে অনুরোধ করিয়া কহিল,—তোমরা শান্ত হও ভাই। তিনি ভেবেছেন হয়তো আমাদের মেরে বা ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধি করবেন কিন্তু আমরা অবিচলভাবে এই খানে দাঁড়িয়ে থেকে তার সে আশা নির্মূল করবো।

বস্তীর লোকেরা খবর পাইয়া ক্ষিপ্তের মতো ছুটিয়া আসিল। ছেলেরাও উত্তেজিত।

ম্যানেজারের সংগী পাইকগুলিও শক্ত হাতে লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরুণ, কামাল সকলের উত্তেজনা শান্ত করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ; ইতিমধ্যে পিছন হইতে ম্যানেজারের বপুর উপরে কে একটা ঢিলও ছুঁড়িল; তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ ম্যানেজারের আদেশে পাইকগুলি লাঠি উঁচাইয়া অগ্রসর হইল।

এমন সময় দিবাকরবাবু মাঝখানে ছুটিয়া আসিয়া পাইকদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া উঠিলেন,—এই থামো।

তাহার সাথে পান্নালাল। সে পাইকদের সম্মুখে যাইয়া দৃপ্তকণ্ঠে আদেশ করিল,—লাঠি নামাও।

—ছোটোবাবু!—পাইকরা ইতস্ততঃ করিয়া লাঠি নামাইয়া ম্যানেজারের দিকে চাহিল।

ম্যানেজার চক্ষু কটমট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এখানে কেন পান্নালাল?

পান্নালাল সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়া মুখ ফিরাইয়া বরুণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে কহিল,—তোমরা দেখো ভাই, কোনো

মারামারি যেন না হয়। মণিকাকে বাবাকে ডেকে আনতে পাঠিয়েছি, তোমরা ওদিকে শান্ত করো, আমি এদিক দেখছি।—

উত্তেজিত জনতা অনেক শান্ত হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া ম্যানেজার পান্নালালের কাছে আসিয়া কহিল,—তুমি এখানে কেন? জানো, তোমার বাবার হুকুমমতো আমি এখানে এসেছি!

—জানি তার হুকুম ছিল, বস্তী নোটিশ দিয়ে উঠিয়ে দেবার। কারণ এইমাত্র আমি জানতে পেরেছি, আপনি বাড়ি তুলবার জন্য বাবার কাছ থেকে এই জায়গাটা চেয়ে নিয়েছেন। প্রথমটা তিনি রাজি হননি, অবশেষে আপনার পীড়াপীড়িতেই রাজি হয়েছেন।—

—পান্নালাল!

— ধমকাবেন না। এদের উঠে যাবার নোটিশ আপনিই বাবাকে দিয়ে দিইয়েছেন। বাবা নোটিশ দিয়েছেন সত্য, কিন্তু মারধর বা অত্যাচার করার কোনো অধিক র আপনাকে দেন্‌নি।—

উত্তেজনায় পান্নালাল কাঁপিতেছিল, ম্যানেজার আগাইয়া আসিয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল,—চল, বাড়ি চল—জেনে আসবে তোমার বাবার কী হুকুম!

পান্নালালের তেজোগর্ভ উক্তিগুলি শুনিয়া সকলে নির্বাক হইয়া ছিল; এবার ম্যানেজারকে তাহার হাত চাপিয়া ধরিতে দেখিয়া আবার সকলে হৈ হৈ করিয়া উঠিল।

ম্যানেজার তাহার হাত ছাড়িয়া উদ্ধত অগ্নিময় দৃষ্টিতে চারিদিক তাকাইয়া, দিবাকরবাবুকে কহিল,—আমি বুঝতে পেরেছি—এ সবের মুলে রয়েছেন আপনি। আচ্ছা, আপনাকে আমি দেখে নেবো।

পাইকসহ ম্যানেজার প্রস্থান করিল। তাহারা যাইতে না যাইতেই পথের মোড়ে রায় বাহাত্বরের শুভ্র মোটর গাড়ি-খানা আগাইয়া আসিতেছে দেখা গেল।

গাড়ির সংগে ম্যানেজার তাহার দলবলসহ আবার ফিরিল। গাড়ি জনতার কাছে আসিতেই দরজা খুলিয়া রায়বাহাত্বর নামিয়া পড়িলেন,—কী ব্যাপার, তোমরা এখানে এভাবে ভীড় করেছো কেন?

বরুণ সম্মুখে আগাইয়া গেল,—আপনার ম্যানেজার জবর-দস্তি করে বস্তীবাসীদের উৎখাত করতে যাচ্ছিলো, তারি প্রতিবাদে আমরা দাঁড়িয়েছি।

—কিন্তু এ জমি আমার, আমিই উৎখাতের হুকুম দিয়েছি।

—তা জানি। কিন্তু এই লোকগুলো তাহলে কোথায় যাবে সেকথা নিশ্চয়ই আপনি একবার ভেবে দেখেননি। আপনার কী এদের নিরাশ্রয় না করলেই নয়?

রায় বাহাত্বর এক মুহূর্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—কোথায় যাবে তার আমি কী জানি।

—কিন্তু ঐই লোকগুলি এতোদিন আপনার আশ্রয়ে রয়েছে—এক রকম আপনারই অনুগ্রহে এইখানে থেকে এরা

পরিবার প্রতিপালন করে জীবন ধারণ করছে। আজ কেন এদের উপর এতোটা নির্দয় হবেন কাকাবাবু?

'কাকাবাবু' সম্বোধন শুনিয়া রায় বাহাদুর চমকিত হইয়া বরুণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চৌদ্দ পনেরো বৎসরের সুকুমার বালকটির নির্ভীক ও স্পষ্ট উক্তিগুলি শুনিয়া তাহার মুখে যেন আর উত্তর যোগাইল না।

কেশব ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন সংগীসহ আসিয়া তাহার পায়ের উপর উবুর হইয়া পড়িল,—আমাদের এমন করে তাড়িয়ে নিরাশ্রয় করে দিও না রাজাবাবু।—আমরা আপনার গোলাম হয়ে থাকতে রাজি আছি।

রায় বাহাদুর পা ছাড়াইয়া লইয়া গম্ভীরমুখে সকলের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন দিবাকরকে, পান্নালালকে, মণিকাকে। সকলেই তাহার দৃষ্টি দেখিয়া নতমুখ হইল। বরুণ, কামাল, উৎকণ্ঠিত মুখে রায়-বাহাদুরের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার একটি হ্যাঁ বা না বলার উপরে এতোগুলি জীবনের ভাগ্য পরিবর্তন নির্ভর করিতেছে।

—বেশ!—ম্যানেজারের দিকে চোখ ফিরাইয়া রায়বাহাদুর গম্ভীরমুখে কহিলেন,—যতোক্ষণ ওদের বাসের অন্য কোনো জায়গা বন্দোবস্ত করে দেওয়া না যায়, ততোদিন ওরা এখানেই থাকুক হরিমোহন।—তারপর সকলের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া কহিলেন,—এমন করে সবাই যখন দল বেঁধে বলছো, তোমাদের

অনুরোধ আমাকে রাখতেই হোলো! যাও ভীড় ভেঙে তোমরা বাড়ি চলে যাও।

সকলে উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মণিকা উৎসাহে ছুটিয়া আসিয়া রায়বাহাদুরের পদধূলি লইল,—বাবা তুমি যে এতো ভালো তা জানতুম না।

রায়বাহাদুর স্মিতচোখে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিলেন মাত্র। তারপর বরুণকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যাইবার মুখে বলিলেন,—তোমার তেজস্বিতায় খুশি হলাম।

বরুণ পদধূলি লইয়া কহিল,—কাকাবাবু বলে যখন ডেকেছি, আশীর্বাদ করুন, তাঁকে যেন কখনো রুষ্ট করার কারণ না ঘটে।

প্রত্যুত্তরে রায়বাহাদুর মৃদু হাসিলেন; তারপর মোটরে উঠিয়া গেলেন।

বস্তীতে তখন আনন্দের ধুম। হয়তো তাহাদের জীবনে এই প্রথমবার খুশির উচ্ছল স্রোত নামিয়াছে। দিবাকরবাবু, এবং সবুজসংঘের অন্যান্যদের জয়গৌরবে বস্তী মুখরিত হইয়া উঠিল। কেশব বারবার কহিতে লাগিল,—তোমাদের জন্যই আমরা বেঁচে গেলাম বাবু! এসো, তোমাদের আজ আমরা খাওয়াবো!

তাহাদের উচ্ছ্বসিত খুশিকে তখন ঠেকায় কে!

কিন্তু সবুজ-সংঘের এই জয়ের আনন্দ শিখাটি হঠাৎ আবার এক ফুৎকারে নির্বাপিত হইয়া গেল।

চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন এবং চৌধুরী গার্লস ইনষ্টিটিউশন উভয়েরই মালিক রায়বাহাদুর চূণীলাল চৌধুরী। উভয় স্কুল পরিচালনার জন্য তিন চার জন লইয়া একটি কমিটি থাকিলেও সেক্রেটারী এবং আসল কর্তৃপক্ষ রায়বাহাদুর নিজে এবং কমিটি সদস্যরাও তাঁহার হাতের পুতুল। রায়বাহাদুর নিজেরই ইচ্ছামতো স্কুল পরিচালনা করেন। এমন কী শিক্ষকদের নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বও তাঁহারই হাতে। এবং পরিচালনার এই কার্যে তাঁহার প্রধান সহায়ক ম্যানেজার হরিমোহন।

ম্যানেজার হরিমোহনের উপর রায়বাহাদুরের অগাধ বিশ্বাস। বাস্তবিকপক্ষে রায়বাহাদুর যে আজ ধনে মানে এতোবড়ো বিরাট ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার মূলে ঐ হরিমোহন। উহারই পরামর্শে চলিয়া রায়বাহাদুরের এতো উন্নতি। এই হরিমোহনের উপর রায়বাহাদুরের, এমন একটা দুর্বলতা আসিয়া গিয়াছিল, যে কখনো তাহার পরামর্শে ব্যতিরেকে কোনো কার্যে তিনি তো হস্তক্ষেপ করিতেনই না, বরং হরিমোহন যাহা বলিত তিনি অকুণ্ঠভাবে তাহাতে সায় দিয়া যাইতেন। বস্তীটা ভাঙ্গিয়া একটা কারখানা স্থাপনের পরামর্শটাও হরিমোহনের। হরিমোহনের সেখানেও স্বার্থ ছিল। শহরে জমি দুর্মূল্য; ইচ্ছা ছিল সেও ঐ বিরাট জমিটার

একাংশ রায়বাহাদুরের নিকট হইতে চাহিয়া লইবে। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধি হইল না দেখিয়া সে আর একটি কূট চাল চালিল।

দিবাকর বাবু মাত্র ছ' মাস হইল চৌধুরী ইনষ্টিটিউশনে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ স্কুলবোর্ডের সভায় একদিন সিদ্ধান্ত হইল ঃ স্কুলের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাইবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে এবং অতিরিক্ত শিক্ষকদের বরখাস্ত করিতে হইবে।

প্রথম বরখাস্ত হইবেন দিবাকর বাবু। রায়বাহাদুরের হাতের স্কুলবোর্ড সমস্বরে রায়বাহাদুরের কার্যকে সমর্থন করিল।

খবরটা আকস্মিক ভাবে প্রচারিত হইয়া সকলকেই বিমূঢ় করিয়া দিল।

বরখাস্ত করিবার যে কারণ দর্শান হইল, তাহাতে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিলনা এবং ইহার পশ্চাতে যে একটা ষড়যন্ত্র রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া সংঘের ছেলেরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

দিবাকরবাবু হাসিয়া কহিলেন,—আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। কলকাঠিটি কে নাড়ছে অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু যাক্, এ নিয়ে তোমরা কোনো গণ্ডগোল কোরোনা।

বরুণ মাথা নাড়িয়া কহিল,—না দিবাকরদা'। এই প্রথমবার আমরা হয়তো আপনার কথায় অবাধ্য হবো। আপনাকে আমরা কোনোমতেই ছেড়ে দিতে পারি না।

সবুজ-সংঘের জরুরী পরামর্শ সভা বসিল। বরুণ কহিল—স্কুলের ব্যয়বৃদ্ধি কথাটা একটা অজুহাত মাত্র। আসল কথা দিবাকর বাবুকে তাড়ানো। কারণ তিনি আমাদের অতি আপনজন। আমাদের বন্ধু পান্নালাল যে রকম খবর দিয়েছে তাতে মনে হয়, এর মূলে রয়েছে ম্যানেজারের কারসাজি। সুতরাং হীন কারসাজিকে বন্ধ করে দিবাকরবাবুকে আমাদের স্কুলে রাখতেই হবে। তিনি চলে গেলে আমাদের সবুজ-সংঘের হবে অপমৃত্যু; তাছাড়া এমন শিক্ষক ও বন্ধুকে কিছুতেই আমরা হারাতে পারিনে। শিক্ষক কমাবার এতোই যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাড়ান না ওরা এমন শিক্ষককে যারা আমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন যারা পড়ানোর অনুপযুক্ত। দিবাকরদাকে আমরা কোনো ক্রমেই বরখাস্ত হতে দেবোনা।

কামাল তাহার কথা সমর্থন করিয়া কহিল,—কালই আমরা স্কুলে হেডমাষ্টারের সংগে দেখা করে ছেলেদের তরফ থেকে আমাদের কথা জানাবো। যদি তাতে কাজ না হয় তবে পরশু থেকে আমরা প্রতিবাদস্বরূপ আর ক্লাসে যাবোনা। কিন্তু তার আগে জানা প্রয়োজন স্কুলবোর্ডের এই অর্ডার কবে থেকে কাজে আসবে।

পান্নালাল বলিল,—অর্ডার তো আজই হয়ে গেছে। কাল চার্জ বুঝিয়ে চলে যাওয়ার দিন।

সুশীল কামালের উক্তি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—আমার মনে হয় কামাল যা বলেছে আমাদের তা-ই করা ভালো।

সুজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—কিন্তু তার আগে অন্য রকম চেষ্টা করলে হোতোনা ?

—কীরকম ?

—এই ধরো কাউকে দিয়ে বলিয়ে—

বরুণ বাধা দিয়া বলিল,—তাতে কোনো ফল হবেনা ভাই। মনে নেই, ঐ বস্তীর ব্যাপারটায় অনেককে দিয়ে বলিয়েছিলাম ? —কিন্তু কারো কথা রায়বাহাদুর রাখলেন ? এতে যাদের পাঠাবো, উলটে তাদেরি অপমান।

—আচ্ছা তাহলে রায়বাহাদুরের সংগে আমরা গিয়ে দেখা করে আমাদের দাবির কথা বলতে পারি, কী বলো তোমরা ?

বরুণ কথাটা সমর্থন করিল। সেদিন বস্তীতে রায়-বাহাদুরের কথাটি মনে পড়িল। বলিল,—বেশ। তা যাওয়া যায়।

—কিন্তু রায়বাহাদুরের দেখা পাওয়া যে মুশকিল—ব্যাংক, কারখানা—এ সবের কাজে সবসময়ই যে তিনি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। আমরা বরং হেডমাষ্টারকে গিয়ে আমাদের কথা বলি, রায়বাহাদুরের কাণে তো তা উঠবেই। নাহয় আরো

জানিয়ে আসবো যে আমরা ছেলেদের পক্ষ থেকে স্কুলবোর্ডের সংগে দেখা করতে চাই—আমাদের দাবির কথা শুনতে হবে।

কামালের এ উক্তি সকলেই সমর্থন করিল। সিদ্ধান্ত হইল : আগে ছেলেরা তাহাদের দাবির কথা জানাইবে, তাহা পূরণ না হইলে প্রতিবাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

সবিতা, মণিকা, প্রভৃতি কয়েকটি চৌধুরী ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীও আলোচনায় উপস্থিত ছিল। সবিতা, একটু উসখুস করিয়া কহিল,—আমি একটা কথা বললো দাদা ?

—বল ?

সবিতা সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—দিবাকরদা আমাদের অতি আপনজন। কেবল চৌধুরী ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রদেরই নয়, সবুজ-সংঘেরও তিনি যে কতোখানি তা পরিমাণ করবার নয়। তোমাদের মতো দিবাকরদা আমাদেরো কম স্নেহ করেন না। আমরাও তাকে এখান থেকে এভাবে যেতে দিতে পারি না। তাই বলছিলাম, কামালদা যেমন বলছেন, যদি এমনিতে আমাদের দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষ না শোনেন, তবে তো প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হবে ?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !

—তাহলে যদি অন্যান্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের আমরা আমাদের এই দাবি সমর্থন করতে ডাক দেই, মনে হয় তারাও সাড়া দেবে ; এবং সবাই মিলে কর্তৃপক্ষের এই কার্যের প্রতিবাদ করলে ফল আশাজনক হওয়ার সম্ভাবনা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রস্তাবটি খুব ভালো—সকলে উৎসাহের সংগে সবিতার কথায় সায় দিল।

পরদিন স্কুলে বরুণ, কামাল এবং সুশীল হেডমাষ্টারের সংগে দেখা করিল। গিয়া দেখে হরিমোহন সেখানে বসা। দুজনেই নিম্নস্বরে কী আলোচনা করিতেছিল।

হেডমাষ্টার তাহাদের দাবি শুনিয়া ব্যংগের হাসি হাসিয়া কহিলেন—একী ইয়ারকী পেয়েছো নাকি ?

—তার মানে ?

—তার মানে কর্তৃপক্ষের যা-খুশি তাই তারা করতে পারেন। তোমাদের কোনো প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। আবদার করলে তো আর চলবে না।

—দিবাকরবাবুকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার প্রতিবাদ এ জানাবারো অধিকার আমাদের নেই ?

—না। তোমাদের অসংগত কোনো আবদার শুনতে স্কুল-বোর্ড রাজি নন।—হেডমাষ্টার বলিতে বলিতে বারংবার ম্যানেজারের দিকে তাকাইতেছিলেন। ম্যানেজার নীরবে বসিয়া ছিল ; সে যেন কোন কথাই শুনিতেছে না।

—অসংগত আবদার ! কোন মাষ্টারকে আমরা পছন্দ করি, কাকে চাই—এ কথাটা তাদের কাছে জানালে অসংগত আবদার হবে ?

—হ্যাঁ হবে! স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে বোর্ড কী শেষে তোমাদের পরামর্শ নিতে যাবে নাকি? স্কুল কমিটির সিদ্ধান্তে তারা আর কারো মত গ্রহণ করতে রাজি নন।

—বাঃ আমাদের স্কুল, আমরা একথা তাদের জানাতে পারবো না?

—তোমরা ছাত্র। স্কুল যেভাবে চলবে, সেইভাবেই তোমাদের চলতে হবে। নিজেদের মতানুসারে যদি স্কুল চালাতে চাও তাহলে নিজেরা যেয়ে স্কুল করো—চৌধুরী ইনষ্টিটিউশন কারু আবদারের জায়গা নয়।—হেডমাষ্টার আর একবার ব্যংগ হাস্যে হরিমোহনের দিকে তাকাইলেন।

বরুণ তবু কহিল,—কিন্তু স্যর দিবাকরবাবুকে আজ এভাবে অন্যায় করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে—

—অন্যায়?—হেডমাষ্টার তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—দেখো বরুণ, তোমরা আমার প্রিয় ছাত্র, তাই এতোক্ষণ তোমাদের কথা শুনেছি, কিন্তু জেনে রাখো, স্কুল কমিটি যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার ওপর কথা বলার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। আমি জানি দিবাকরবাবু তোমাদের খুব প্রিয়জন, কিন্তু স্কুল কমিটি যদি তাকে রাখতে না পারে, তবে বৃথা আপত্তি করে কী লাভ হবে বলো? দিবাকরবাবুর পক্ষ হয়ে আজ অনেক কথা তাদের জানিয়েছি কিন্তু স্কুলের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে তাঁকে এবং আরো দুয়েক-জনকে ক্রমে ক্রমে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই! তোমরা

লেখাপড়ায় মন দাও, এসব হাংগামার মধ্যে মাথা গলাতে এসোনা। যাও।

বরুণ ভাবিল, অধিক কথা বলিয়া লাভ নাই। হেডমাষ্টার মশাইর সংগে হরিমোহনের মাখামাখির কথাটা কাহারও অজানা নয়। হরিমোহনের কৃপার উপরেই তাহার চাকরীও নির্ভর করে।

তবু আসিবার সময় বলিল,—কিন্তু স্যর, আমরা স্কুলবোর্ডের সংগে দেখা করতে চাই, আশা করি আপনি আমাদের কথাটা তাদের জানাবেন। এই আমরা দরখাস্ত রেখে গেলাম। যদি সোজা পথে আমাদের কথা তারা শুনতে রাজি না হন, তবে আমরা অন্য পথ নিলে আশা করি আমাদের দূষবেননা।

হেডমাষ্টার চাহিয়া দেখিলেন হরিমোহন ছেলেদের স্পর্ধায় চকিত হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন,—বাঃ খুব বিনয়ী তো আপনার ছেলেরা।

হেডমাষ্টারের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। বরুণ তাহার সংগীদেরসহ চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইতেই না বাড়াইতেই তিনি গম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলেন,—বরুণ!

বরুণ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—এদিকে এসো।—ডেস্কের ভিতর হইতে বেতখানা বাহির করিয়া হেডমাষ্টার তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।—তোমার উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তোমাকে আমি শাস্তি দিতে পারি জানো?

বরুণ অবাকমুখে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। কোনো অন্যায় করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। খানিক পরে মৃদুস্বরে কহিল,—কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় করিনি স্যর।

—তুমি আমারি ছাত্র হয়ে আমার উপর চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে যাও, এটা অন্যায় নয়?—রাগে হেডমাষ্টারের হাতের বেতখানা কাঁপিয়া উঠিল।

কামাল কী বলিতে যাইতেছিল, বরুণ তাহাদের বাধা দিয়া বলিল,—

—আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি সেরকম কোনো ব্যবহার করিনি তো!

—বটে পাজি ছেলে। ফের মুখের উপর কথা!—হেডমাষ্টার অসহ্য ক্রোধে সপাং সপাং করিয়া তাহাকে দুই ঘা বেত কষাইয়া দিলেন। কামাল সুশীল শিহরিয়া দেখিল, বরুণ চক্ষু বুজিয়া নীরবে বেদনা সহ্য করিল।

হেডমাষ্টার রাগে ফুঁসিতে ফুঁসিতে আবার তাহার চেয়ারে বসিলেন,—তোমরা আমার স্কুলের সেরা ছাত্র। মিষ্টি কথা বলি বলে ভেবোছো বুঝি তোমাদের সব দুর্বিনীত ব্যবহার আমি সহ্য করবো। যাও, মনে রেখো, আর কখনো যেনো এরকম অশিষ্ট না হও। খবরদার, আর এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে এসোনা। যদি আর কখনো অন্যায় আচরণ দেখি, তাহলে কী করে তা শায়েস্তা করি তাও দেখে নিও।

বরুণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। ঠোঁট কামড়াইয়া প্রাণপণে আবেগ সংবরণ করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—আমি কোনো অন্যায় করিনি স্যর!

বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এবং নমস্কার করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

হেডামাষ্টার হরিমোহনের দিকে চাহিয়া কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—জিদ দেখেছেন! দিলাম টিট করে, আর কখনো ঔদ্ধত্য না দেখায়! কী বলেন, ঠিক করিনি? ছেলেটা কিন্তু ভালো, ক্লাশ টেনের ফার্ষ্ট বয়। এরি কথাই তো আপনি বলছিলেন, না? কিন্তু সব গণ্ডগোলের মূল ঐ—বুঝলেন কী না!—হরিমোহন মাথা নাড়িল।

পরদিন যথারীতি স্কুলের ঘণ্টা বাজিল, কিন্তু একটি ছেলেও ক্লাসে আসিল না। হেডমাষ্টার ডাকে একখানা চিঠি পাইলেন —দিবাকরবাবুর দরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহৃত না হইলে একটি ছেলেও আর স্কুলে আসিবে না। নিচে স্কুলের প্রত্যেকটি ছেলের নাম দস্তখত করা।

হেডমাষ্টার অগ্নিমূর্তি হইয়া সকলকে একটাকা করিয়া জরিমানা করিলেন।

কিন্তু পরদিনও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হইল না। বরং চৌধুরী ইনষ্টিটিউশনএর ছেলেদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া অন্যান্য স্কুলের ছেলেরাও ক্লাস ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত আসিয়া যোগ দিল। শহরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। অভিভাবকেরা ব্যস্ত হইয়া ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিলেন। হেডমাষ্টার প্রমাদ গণিলেন। চৌধুরী ইনষ্টিটিউশনের পাঁচশো ছেলেই যদি বদলী-পত্র লইয়া অন্য স্কুলে চলিয়া যায়, তাহা হইলে স্কুল বন্ধ না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং তিনি স্কুল এবং নিজেদের চাকুরী বাঁচাইবার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের লইয়া অভিভাবকদের সংগে দেখা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাহাদের জানাইলেন—ব্যাপারটা সামান্য। ছেলেরা খামখেয়ালী করিয়া লেখাপড়া নষ্ট করিতেছে, তাঁহারা যেন শাসন করিয়া তাহাদের স্কুলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন।

কিন্তু তাহাতেও কিছু হইল না। ছেলেরা শাসন মানিল না। বরুণ ধর্মঘটের তৃতীয় দিনে অভিভাবকদের আহ্বান করিয়া তাহাদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করিতে অনুরোধ করিল। সংগে সংগে ইহাও বলিল যে, শিক্ষায়তনে কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারিতার স্থান থাকা উচিত নয়। যে বিদ্যালয় হইতে দেশের ভাবী সন্তানেরা শিক্ষিত হইয়া বহির্গত হইবে, তাহার পরিচালনা ব্যাপারে কোনো কলুষ থাকিলে তাহা ছাত্রদের মনেও সংক্রামিত হইবে। আজ স্কুলের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা এমন লোকের হাতে রহিয়াছে, যাহারা ছাত্রদের প্রতি মোটেই

সহানুভূতিশীল নহেন। আমরা বলি ইহার পরিচালনা এমন লোকের হাতে দেওয়া হউক, যাহারা ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধা ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে পরিচালনা করিবেন। তাই আমরা প্রস্তাব করি এবং দাবিও করি যে অভিভাবকদের দ্বারা গঠিত একটি কমিটির উপর স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হউক। রায় বাহাদুর ইহার সেক্রেটারী থাকুন, ক্ষতি নাই, কিন্তু কমিটিতে অন্যান্য সদস্যরা তাহার ইচ্ছামতো কেউ না থাকিয়া অভিভাবকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হউক। স্কুলের মহৎ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহাকে সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা হউক।

বরুণের এই প্রস্তাবে কেহ চিন্তিত হইলেন, কেহ ভীত হইলেন, কেহবা খুশি হইয়া তাহাকে সমর্থন করিলেন। একজন অভিভাবক বলিলেন,—তোমরা ছাত্র, এখন তোমাদের লেখাপড়ার সময়। আমার মনে হয়, দিবাকরবাবুকে পুনর্নিয়োগের দাবি তোমাদের খুবি ন্যায়সংগত। কিন্তু অন্য যে দাবিটার কথা তোমরা বলছো, সেটা আমরা যারা অভি-ভাবক আছি তাদের বিবেচনার উপরেই ছেড়ে দেওয়া ভালো। তোমাদের প্রধান দাবি দিবাকরবাবুকে নিয়োগ করা—সেটা মানা হলেই তোমরা সন্তুষ্ট থেকো। বাদবাকি যা করবার তা আমরাই করবো।

ছেলেরা তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লইল।

সেইদিন রাত্রে বরুণ পড়ার ঘরে বসিয়া সমস্ত বিষয়টা আগাগোড়া চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় তাহাকে বিস্মিত করিয়া উদভ্রান্তভাবে হেডমাষ্টার মশাই তাহার ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন,—তোমার সংগে একটু কথা আছে বরুণ।

হেডমাষ্টার কালীকিংকরবাবু মানুষটি বৃদ্ধ। রোগা খাটো চেহারা। মাথার চুলগুলি পাকিয়া খুব সাদা। প্রকৃতিটা একটু অস্থির এবং অব্যবস্থিত। চলায় বলায় কোনোদিন অহংকৃত ভাব থাকিলেও আজ বার্ধক্যের ভারে, দারিদ্র্যের চিন্তায় তাহার অনেকাংশই অন্তর্হিত। বিরাট সংসার তাহার। বরুণ জানে মাসান্তে দেড়শো টাকা মাইনেতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তিনি করিয়া উঠিতে পারেন না।

বরুণকে তিনি খুব স্নেহ করিতেন। লেখাপড়ায়, বিতর্ক-সভায় প্রভৃতি স্কুলের যাবতীয় ক্ষেত্রে সে সেরা ছেলে। সেদিন অকস্মাৎ তাহার হাতে শাস্তি পাইয়া বরুণ অভিমান-বশেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। পরে সে বুঝিতে পারিয়াছিল, হেডমাষ্টার মশাইএর এই আচরণের মধ্যে ম্যানেজারকে সন্তুষ্ট করা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য নাই। অভিমান তখন তাহার প্রতি মমতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

সে সসম্মানে তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কী কথা স্যর?

কালীকিংকরবাবু তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া অকস্মাৎ

বলিয়া উঠিলেন,—তোমাকে সেদিন রাগের মাথায় মেরেছি, কিছু মনে কোরো না বাবা। সত্যি, তোমার কোনো অন্যায় ছিলো না। রাগ হলে আমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আমিও জানি দিবাকরবাবুকে ওরা অন্যায় করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। দিবাকরকে আমিও পুত্রের মতো স্নেহ করি। কিন্তু —আবেগে কালীকিংকরবাবুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

বরুণ অসীম শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল, —আমি জানি স্যর, আপনিও তাকে ভালোবাসেন, তাইতো আপনার কাছে আমরা গিয়েছিলাম।

বরুণের মাথাটা হেডমাষ্টার মশাই কোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন।—আমি জানি তোমরা একদিন এই দেশের মুখোজ্জ্বল করবে। তোমাদের আজকের এই দাবির প্রতি আমাদেরো সহানুভূতি আছে কিন্তু সেকথা জানানোর উপায় নেই বাবা। এই চাকরীটা আছে বলে তবু যাহোক-কিছু দুবেলা ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতে পাই। জানোই তো বয়স হয়েছে বলে কতোবার আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, কেবল ঐ ম্যানেজারটার অনুগ্রহেই এতোদিন টিঁকে আছি। রায় বাহাদুর নিজে তো কিছু বিশেষ দেখেন না—সব হর্তাকর্তা ঐ ম্যানেজার। তাই তাকে খুশি রাখতে যেয়ে তোমাকে তখন কটুকথা বলেছি, মেরেছি—হয়তো তার জন্য তুমি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে আছো আমার ওপর—

টপ টপ করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে বরুণের মুখে কয়েক

ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি কহিল,—না স্যর, আমি সত্যিই কোনো রাগ করিনি। তখন দুঃখিত হলেও পরে আমি বুঝেছি, আমাকে না মেরে আপনার উপায় ছিলো না।—আমি আপনার ওপর এতোটুকু অসন্তুষ্ট হইনি।

—জানি, তুমি মহৎ ছেলে।—চক্ষু মুছিয়া হেডমাষ্টার মশাই তেমনি উদভ্রান্তস্বরে কহিলেন,—কিন্তু তবু, জানো বরুণ, আর আমার স্কুলে চাকরী করা পোষালো না।—

—কেন? বরুণ চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল।

—ঐ ম্যানেজারের খোসামোদ করে আমাদের চাকরী। সব সময় তার মন জুগিয়ে চলতে হয়। আজ তা আর পারলুম না।

—কেন, কী হয়েছে স্যর?

—দিবাকরবাবুকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় আমরাও খুব দুঃখিত হয়েছি বরুণ। জানি ওর কোনো দোষ নেই, আজ চল্লিশবছর মাষ্টারি করছি, কিন্তু এমন লোক চোখে পড়েনি। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের সে আপন করে নিলো। কিন্তু কেন জানিনে ঐ হরিমোহন তাকে ভালো চোখে দেখলে না। শেষ পর্যন্ত তাড়ালোই। তোমরা তাকে পুনর্নিয়োগ করবার জন্য আন্দোলন সুরু করেছো। আমিও চাকরীর মুখ চেয়ে ম্যানেজারের কথামতো তোমাদের প্রতি‍‍‍‍ ‍‍শক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার আমাকে বললে তোমাকে এবং তোমার আরো দু'একজন বন্ধুকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে। হ্যাঁ

আমি জানি তা অন্যায়, তাই স্বীকৃত হইনি। একদিকে চাকরী অন্যদিকে ন্যায়বোধের সংগে যুঝতে যুঝতে অবশেষে আমার ন্যায়বোধেরই জয় হোলো। আমি তার কথামতো কাজ করতে অসম্মতি জানিয়ে চলে এসেছি, কালই আমি পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দেবো।

—সে কী!

—হ্যাঁ, তাদের এও বলে এসেছি—স্কুলের ব্যয়বৃদ্ধি কথাটা একটা অজুহাত মাত্র। দিবাকরকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় কোনো যুক্তিযুক্ততা নেই। তাকে স্কুলে পুনর্বার না নিলে এবং এইমতো স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ না হলে আমারো স্কুলে কাজ করা অসম্ভব। হেডমাষ্টার মশাই একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিলেন,—আমিও আজ থেকে তোমাদেরি দলে! তোমাদের সংঘের নাম সবুজ-সংঘ না?

—হ্যাঁ।

—আমি তো বৃদ্ধ। হলদে পাতার দলে। ঝরে পড়বার দেরি নেই।—কালীকিংকরবাবুর স্বর আবার বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

—কিন্তু হলদে সবুজ দুই পাতাতেই গোটা গাছ। আপনাকে আমাদের সংঘের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পেলে আমরা ধন্য হবো। আর তাছাড়া আপনিও যখন স্যর এভাবে আমাদের দাবি সমর্থন করছেন, সে সময় কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবি মেনে না নিয়ে পারবেন না।

—হ্যাঁ, রায় বাহাদুর স্বয়ং সব ব্যাপারটা জানতে পারলে তোমরা জয়যুক্ত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু ঐ ম্যানেজারটা যে সব সময়ই তাকে আগলে আছে।—

—তাহলেও আপনার এতোখানি এগিয়ে আসা আমাদের জয়লাভকে নিকটবর্তী করে তুলেছে স্যর।

পরদিন সমস্ত ছেলেরা দল বাঁধিয়া রায়বাহাদুরের বাড়িতে উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে রায়বাহাদুর বাড়িতেই ছিলেন। ছেলেরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিল; ম্যানেজার নানা অজুহাত তুলিয়া তাহাদের ফিরাইতে চেষ্টা করিল, রায়বাহাদুরকে কোনো সংবাদ তো দিলই না। এবং দারোয়ান দ্বারা ছেলেদের বাহির করিয়া দিয়া গেট বন্ধ করিয়া দিল। ছেলেরা ক্ষিপ্ত হইয়া নানাপ্রকার ধ্বনি তুলিয়া শোরগোল সুরু করিয়া দিল।

ফলে স্বয়ং রায়বাহাদুরকেই গাড়ি বারান্দার ছাদে দেখা গেল। ছেলেরা তাহাকে দেখিয়া আরেকবার কলরব করিয়া উঠিল।

রায়বাহাদুর নিচে নামিয়া তাহাদের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিলেন,—কী ব্যাপার, গোলমাল করছো কেন এতো, কী চাও?

বরুণ তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল,—আপনি কী আমাদের দরখাস্ত পাননি?

—দরখাস্ত! কই না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি পার্শ্ববর্তী

ম্যানেজারের দিকে তাকাইলেন। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল।

—না তোমাদের কোনো দরখাস্ত আমি পাইনি। কিন্তু তোমাদের অভিযোগ আমি জানতে পেরেছি। আজ দুদিন পরে আমি শহরে এসে শুনলাম, তোমরা দিবাকর বাবুকে আবার স্কুলে নেবার জন্য দাবি করছো এবং তোমাদের হেডমাষ্টারও সেইজন্য পদত্যাগ করেছেন। অবশ্য শুনলাম শহরেরি অনেকের কাছে—কিন্তু যাক, মোটামুটি তোমরা তাকে স্কুলে আবার নিতে বলছো?

—হ্যাঁ!

—কিন্তু জানো, তিনি একজন জেল ফেরৎ দাগী আসামী?

'দাগী আসামী!' ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল।

—হ্যাঁ, দাগী আসামী। দুবৎসরের মতো তিনি জেল-খেটেছেন।

কামাল জানিত দিবাকরবাবু কংগ্রেসের একজন কর্মী। আড়াই বৎসর আগে 'আপত্তিকর' বক্তৃতা দিবার 'অপরাধে' তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কহিল,—তাহলেও তিনি দেশের মঙ্গলের কাজে জেলে গিয়েছিলেন। বিদেশী রাজার চোখে তিনি অপরাধী হতে পারেন, কিন্তু তবু তিনি আমাদের পরম মিত্র।

রায়বাহাদুর তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন,

—বড়ো বড়ো কথা বোলোনা কেবল। ভুলিয়ে ভালিয়ে তিনি তোমাদের হাত করেছেন তা বুঝতে পারছি ; কিন্তু এই বয়সে কিছু না জেনে শুনে, কিছু না বুঝেসুঝে তোমরা যে তার কথায় এভাবে চলছো, এর পরিণাম খুব ভাল হবে না, বুঝলে? তারপর ম্যানেজার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—দিবাকরকে তখন স্কুলে ঢুকিয়ে মহা ভুল করেছি হরিমোহন। তা না হলে আজ ছেলের দল দিয়ে এতোটা হৈ চৈ করার সাহস সে পেতোনা!

ম্যানেজার ব্যগ্রভাবে তাহাকে সমর্থন করিল,—আজ্ঞে সব তো বলেছি আপনাকে! সেই তো পেছন থেকে এদের উসকে দিচ্ছে।—

কথাটা বরুণের কানে গেল ; প্রতিবাদ করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—না, মিছে তাকে দূষবেন না। তিনি আমাদের কিছু করতে বলেননি ; বরং নিষেধ করেছিলেন। আমরা তাকে ভালোবাসি বলেই তাকে পুনর্নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।

রায়বাহাদুর বরুণকে চিনিতেন। এই ছেলে বছর বছর পুরস্কার বিতরণী সভায় অজস্র পুরস্কার লাভ করে, স্কুলের সবচেয়ে সেরা ছাত্র ইত্যাদি বিষয় তাহার অজানা ছিল না। সেদিন দেখিয়াছেন, বস্তীবাসীদের পক্ষ হইয়া ছেলেরা যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছে তাহারও নায়ক এই বরুণ এবং আজিকার এই ছেলেদের নেতৃত্বও যে সে-ই করিতেছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিছুক্ষণ চক্ষু নামাইয়া তিনি ভাবিলেন।

বরুণ একটুকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল,—আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি কাকাবাবু, আপনি আমাদের এই একান্ত অনুরোধ কিছুতেই উপেক্ষা করবেন না।

রায়বাহাদুর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন, তারপর মনস্থির করিয়া কহিলেন,—শোনো বরুণ, সামান্য ব্যাপারটাকে তোমরা অনেক বড়ো করে তুলেছো। সত্যি বলতে কী দিবাকরকে বরখাস্তের আদেশ দিয়েছিলাম নানাকারণে—তার মধ্যে একটি কারণ পড়াশুনো ত্যাগ করে তোমাদের এইভাবে মাতিয়ে তোলা। নানা অভিযোগ আমার কাণে এসেছিলো। আজ দেখছি তোমরা তার হয়ে অনেক কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছো। মনে হচ্ছে, হয়তো লোকটার মধ্যে সত্যি এমন কোনো বড়ো গুণ আছে যার জোরে তোমাদের সকলের মন সে দখল করেছে—এমন কী আমার ছেলেমেয়েরাও আজ তোমাদের সাথে যোগ দিয়েছে।......

দিবাকরকে আবার যাতে স্কুলে নেওয়া হয় সেজন্য আরো অনেকে আমাকে অনুরোধ করেছেন—এমন কি হেডমাষ্টার মশাইও এই ব্যাপারে পদত্যাগ করেছেন; তা এবারকার মতো তোমাদের দাবি একটি সর্তে আমি মেনে নিতে পারি।—

—কী সর্ত বলুন?

—দিবাকরকে আবার স্কুলে নিতে পারি এই সর্তে যে

তোমাদের সবুজ-সংঘ বলে যে সমিতিটি আছে, তার সংগে তার সমস্ত সংপর্ক বর্জন করতে হবে।

বরুণ নিরুত্তর। ছেলেরা গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

—যদি আমার এই সর্ত তোমরা মেনে নাও, তাহলে তাকে স্কুলে নেওয়া হবে। তোমরা কাল থেকে যথারীতি ক্লাশে যোগদান কোরো।

কামাল বরুণের কাণে কাণে কী কহিল। বরুণ অন্যান্য ছেলেদের প্রতি চাহিয়া কহিল,—বেশ, আমরা রাজি।

—তাহলে তোমরা কাল থেকে স্কুলে যাবে। আজ রাত্রেই স্কুলবোর্ডের মিটিং ডেকে আমি তাকে পুনরায় বহাল করবার ব্যবস্থা করছি।—

ছেলেরা বিজয় গৌরবে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু বরুণ, কামাল, সুশীল কেহই যেন সে জয়ের আনন্দ পুরাপুরি উপভোগ করিতে পারিল না। কেবলই তাহাদের মনে হইতে লাগিল, কোথায় যেন দুর্যোগের থমথমে মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। এখন হইতে সবুজ-সংঘের পথ আর বিপন্মুক্ত, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। নির্বিবাদে আর হয়তো তাহার কার্য পরিচালনা সম্ভব হইবে না।

অন্যান্য ছেলেদের সহিত জয়ের আমোদে যোগ না দিয়া তাহারা দিবাকরবাবুর গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

একটা সরু গলির মধ্যে দিবাকরবাবুর বাসা। ছোটো অপরিসর ঘর, একটি বিছানা আর প্রচুর বইয়ের স্তূপে আচ্ছন্ন। বরুণ, কামাল প্রভৃতি এখানে যখনই আসিয়াছে, দেখিয়াছে তাহায় মধ্যে তিনি নিমজ্জিত হইয়া আছেন। দিবাকরবাবুর বাড়ি গ্রামে। তাহাদের অবস্থা এমন নয় যে চাকুরী না করিলেই নয়, কিন্তু স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যই নাকি তিনি স্কুলের এই চাকুরী গ্রহণ করিয়াছেন।

উহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তিনি তাহার জনৈক বন্ধুর সহিত কী আলোচনা করিতেছেন। তাহাদের দেখিয়াই তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো, বোসো—বলিয়া বিছানার একাংশ হইতে কাগজপত্র পরিষ্কার করিয়া চাদরটুকু বসিবার জন্য বিস্তৃত করিয়া দিলেন।

সুশীল কহিল,—শুনেছেন দিবাকরদা, আমাদের দাবি রায়বাহাদুর মেনে নিয়েছেন।

দিবাকরবাবু অবাক হইয়া গেলেন।

—সত্যি? তাহার বন্ধুটিও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন।

—হ্যাঁ। আসলে এ সব ব্যাপার করিয়েছে ঐ ম্যানেজার। রায়বাহাদুর ততো খারাপ বলে মনে হয় না।

বরুণ কহিল,—রায়বাহাদুর আপনার সম্বন্ধে কী বলেছেন জানেন দিবাকরদা? বললেন তিনি দাগি আসামী জেনেও—বরুণ আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বলিয়া গেল।

দিবাকরবাবু প্রশান্তমুখে তাহাদের কথা শুনিলেন।

—কাল আমরা আপনাকে শোভাযাত্রা করে স্কুলে নিয়ে যাবো দিবাকরদা! আপনার কোনো আপত্তি শুনবোনা।

দিবাকরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন,—পাগল আর কী! যাক, এইবার তোমরা শোনো—গম্ভীরমুখে বন্ধুর দিকে একবার চাহিয়া দিবাকরবাবু কহিতে লাগিলেন,—আমার জন্য তোমরা এতোটা হৈ চৈ না করলেও পারতে। তা আমার নিষেধ না শুনেও যখন তোমাদের আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে, আমিও এতে খুশি হলাম।—বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—এ জয় শুধু ওদের নয় সুশোভন, এ জয় আমারি।

সুশোভন স্মিতমুখে কহিলেন,—তা বুঝেছি। তুমি যাদের হৃদয় জয় করেছো, তাদের জয়লাভে তো তোমারি গৌরব।

দিবাকরবাবু তাহার স্বভাবসুলভ বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি ছেলেদের দিকে তুলিয়া আবার কহিলেন,—সবুজ-সংঘের সংগে এমনিতেও আমার আর সংপর্ক রাখা চলতো না বরুণ। আমার কাজ ফুরিয়েছে। তোমাদের আন্দোলনের ফলে চাকরী আবার ফিরে পেলেও, আমার আর তা করার ইচ্ছে নেই। আমি আজই শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

—সেকী! কেন?—সকলে বিস্ময়োক্তি করিয়া উঠিল।

দিবাকরবাবু সহাস্যে সুশোভনের দিকে চাহিয়া কহিলেন—এ পাগলদের সে কথা কী করে বোঝাই সুশোভন?

ছেলেরা সত্যি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। দিবাকর-

বাবু কয়েকদিন শহরে ছিলেন না, ইহা তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়াছেন এই সুশোভনকে লইয়া, ইহার মধ্যে হঠাৎ এমন কী ঘটিল যার জন্য তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে।

দিবাকরবাবু নতমুখে উত্তর ভাবিতেছিলেন।

ছোটো ঘরখানিকে তখন বৈকালের ছায়া আরো ম্লান করিয়া তুলিয়াছে। চতুর্দিকেই কেমন একটা বিষন্ন আবহাওয়া। দিবাকরবাবু তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টি দেখিয়া তাহার সেই স্বভাব-সিদ্ধ বিষন্ন হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমার আর এখানে থাকার উপায় নেই। জানোতো আমি এককালে রাজনীতি করতাম, এবং এখনো করি। সুশোভনকে দেখছো, এও আমার একজন সহকর্মী বন্ধু। ও আমাকে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছে।

—কেন? কোথায় যাবেন?

—তার কী কিছু ঠিক আছে!—তবে যাচ্ছি দেশের কাজে। নিয়ত যে অত্যাচার ও লাঞ্ছনার নাগপাশ আমাদের পিষে মারছে, দেশকে তা থেকে মুক্ত করতে আমাদের ডাক এসেছে। তোমাদের ভালোবাসার টানের চেয়েও তার আহ্বান যে অনেক বড়ো ভাই।

ছেলেরা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বরুণ অস্ফুটস্বরে কহিল,—সে কী কাজ দিবাকরদা, আমরা করতে পারিনা?

—পারো বইকী। তোমরাও তো একদিন তাই করবে। আজ শেখো, জানো, চতুর্দিকে চেয়ে নিজেদের অবস্থাটা দেখতে শেখো। দুঃখকষ্ট ভরা দেশে প্রতিকারের পথ তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে। যে আদর্শ নিয়ে তোমরা সবুজ-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছো, একদিন দেখবে ব্যাপকতর ভাবে সেই আদর্শই আমরাও গ্রহণ করেছি। আমরা তো সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় থাকবো, সেই ক্ষণের প্রতীক্ষা করবো কামাল, যখন তোমরাও সেই বৃহত্তর কল্যাণ আদর্শ সম্মুখে রেখে সৈনিকের মতো আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে—

নিস্তব্ধ ম্লান ঘরে দিবাকরবাবুর সেই কণ্ঠস্বর মন্ত্রমুগ্ধের মতো সকলে শুনিতে লাগিল। সেই পুরাকালে তপোবনে তপোবনে মুনি ঋষিগণ জীবন ও জগৎ সংপর্কে যেভাবে শিষ্যদের জ্ঞানদান করিতেন দিবাকরবাবু ও তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট ছেলেরা যেন সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া সুশোভনবাবুর মনে হইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা বলিয়া দিবাকরবাবু কহিলেন, —আমার উদ্দেশ্য তো কেবল চাকরী করা নয় সুশীল। যে ব্রত গ্রহণ করেছি তা উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিরাম নেই। আর তোমাদেরও যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহায্য করেছি এই তো আমাদের কাজ। সেকাজ আমার এবার ফুরিয়েছে। এখন ডাক এসেছে অন্যদিকের।

সুশোভন তাড়া দিলেন,—সময় কিন্তু কম দিবাকর, তাড়াতাড়ি করো।

অনেকক্ষণ পরে একজন অস্ফুটস্বরে কহিল,—কাল গেলে হয় না দিবাকরদা ?

দিবাকরবাবু কহিলেন,—না ভাই। কিন্তু কেন ?

—সবুজ-সংঘের সকলের সাথে দেখা করে যাবেন না ?

—সে সময় হোলোনা আর ; তোমরা আমার হয়ে তাদের বোলো। তোমরা না এলে হয়তো তোমাদের সাথেও দেখা করে যেতে পারতুমনা। আমায় এই না জানিয়ে যাওয়ার জন্য সকল ভাইবোনকে ক্ষমা করতে বোলো। বুঝতে পারছি, হয়তো অনেকেই অসন্তুষ্ট হবে, কিন্তু উপায় নেই ভাই।

সুশোভনের তাড়ায় দিবাকরবাবু চকিত হইয়া বলিলেন,—এবার তাহলে উঠি—জিনিসপত্র বেঁধে ফেলা যাক।

ছেলেরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। দিবাকরবাবু নানাপ্রকারে তাহাদের উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইয়া গেল।

বরুণ, কামাল তবু যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলনা। ধীরে ধীরে দিবাকরবাবুর সহিত সকলেরই এমন একটা সংপর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে,—ভাই, বন্ধুর বা অতি আপন জনের সহিত তুলনা করিয়াও যেন তাহার শেষ হয়না। ছেলেরা প্রথম তাহাকে করিয়াছে শ্রদ্ধা, তারপর ভক্তি এবং ক্রমান্বয়ে সেই ভক্তি রূপান্তরিত হইয়াছে অকৃত্রিম ভালো-

বাসায়। স্কুলে তো আরো শিক্ষক রহিয়াছেন কিন্তু কোনো-দিন তাহাদের কাছে ঘেঁষিতেও তাহারা ভরসা পায় নাই। শ্রদ্ধার চাইতে তাহাদের ভয় করিয়াছে বেশী। কিন্তু দিবাকর বাবুর মধ্যে এমন কী গুণ ছিল, যাহাতে প্রথমদিনেই তিনি ছেলেদের নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন। মনে পড়ে তাহার স্কুলে আসার প্রথমদিনে, প্রথম ক্লাশে সেই ঘটনাটির কথা, যাহার ফলে অমন যে দুরন্ত ছেলে সুশীল সে-ও তাহার একজন প্রধান অনুরক্ত হইয়া উঠিল।......

ভূগোলের ক্লাশ। ছিমছাম ও শীর্ণ ফর্শাচেহারার নোতুন মাষ্টারটি পড়াইতে আসিলেন। সকলে নাম জানিল দিবাকর ভট্টাচার্য। ভারতবর্ষের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রথমেই তিনি অপূর্ব ভাষায় বলিলেন,—এতোবড়ো বিরাট দেশে জন্মগ্রহণ করে এই দেশের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ভাবে জানার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতিক সম্পদে বৈচিত্র্যে আমাদের দেশ অতুলনীয়া—কিন্তু তবু তোমরা দেখো আমাদের দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যের সীমা নেই। অথচ এই আসমুদ্র-হিমাচল স্বাধীন ভারতবর্ষে একদিন—

দিবাকরবাবুর বর্ণনার সেই অপূর্ব ভংগিমা ভুলিবার নয়। গৌরব ও বৈভবের কথা বিবৃত করিয়া তিনি কহিলেন,—শুধু জ্ঞানলাভ করা নয়, আবার এই দেশকে নোতুন করে

গৌরবান্বিত করবার দায়িত্বও তোমাদের। এই দেশকে তোমরা প্রণাম করো। জ্ঞানলাভের সংগে সংগে আবার এই দেশকে স্বাধীন করবার সংকল্প গ্রহণ করো।

অভিভূত হইয়া সকল ছেলে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছিল। সুশীল ইত্যাদি দুরন্ত ছেলেরা, যাহারা নোতুন মাষ্টারকে জব্দ করিবার কথা ভাবিয়াছিল, তাহাদের সকলের দুষ্টবুদ্ধিও সহসা বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

অবশেষে সুশীল অন্যপ্রকারে ব্যর্থ হইয়া পার্শ্ববর্তী ছেলেটিকে অনর্থক চিমটি কাটিয়া, ফাজলুমি করিয়া একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া তুলিল। দিবাকরবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া স্নেহমধুর তিরস্কারে মাত্র একটি কথা তাহাকে কহিলেন,—ছিঃ সুশীল! দুষ্টুমি করাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু যারা একদিন এই দেশেরই মহৎ মানুষ হবে, তাদের এই দেশের কথা অবহেলা করা শোভা পায়না। জানি, তুমি বুদ্ধিমান। তোমার সেই বুদ্ধিকে আজ শুভ কাজে নিয়োজিত করো।

তাহার সেই স্নেহকরুণ দৃষ্টির তিরস্কারের মধ্যে কী ছিল সুশীল তৎক্ষণাৎ শান্ত হইয়া গেল।

তারপর ধীরে ধীরে আজ সে-ও দিবাকরবাবু অন্যতম অনুরাগী হইয়া তাহার সহিত অন্তরের আত্মীয়তায় আবদ্ধ হইয়াছে।

বিদায়ের সময় সকলেরই চক্ষু ছলছল করিতেছিল। বরুণ হঠাৎ হেডমাষ্টারমশাইর কথা স্মরণ—করিয়া দিবাকরবাবুকে সেইদিন রাত্রের ঘটনাটা জানাইয়া কহিল,—তার সংগে একবার দেখা করে যান দিবাকরদা।

—বেশ। আমার যাবার পথেই তাঁর বাড়ি পড়বে। তাকে আমি বুঝিয়ে পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করে যাবো।

গাড়ি ডাকিয়া সুশোভনবাবু সমস্ত মালপত্র উঠাইলেন। দিবাকরবাবু গাড়ির দরজা ধরিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, তোমরা তাহলে এসো। আমি তোমাদের ভুলবোনা। যতো শীগ্‌গীর পারি, আবার তোমাদের কাছে আসবো।

—কবে আসবেন?

—যেদিনই হোক কথা দিলুম তোমাদের কাছে আবার আসবোই!

সকলে হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল।

দিবাকরবাবু সকলকে বুকে জড়াইয়া ছলছল চক্ষে বলিয়া উঠিলেন,—ছিঃ ভাই, এমন কী মানুষ আমি, যার কাছে নত হয়ে নিজেদের খাটো করছো! যাও, সারাদিন ধরে হৈ চৈ করে তোমরা পরিশ্রান্ত, বাড়িতে হয়তো সবাই ভাবছেন—যাও, বাড়ি যাও। বলিয়া একে একে সকলকে স্নেহাশীষ জানাইয়া, তাহাদের পিতামাতাকে প্রণাম জানাইতে বলিয়া দিবাকরবাবু গাড়িতে উঠিলেন।

গাড়ি চলিতে সুরু করিল। বরুণ, কামাল, সুশীল—সকলে জলভরা চোখে তাহার যাত্রাপথের দিকে তাকাইয়া রহিল; তাহাদের অন্তরের কোনখানে একটা স্থান যেন হঠাৎ শূন্য হইয়া গেল।

পূর্ববর্তী ঘটনার পর কয়েকদিন কাটিয়া গেছে। স্কুলের অবস্থা আবার স্বাভাবিক। গত কয়েকদিনের ব্যস্ততা ও কোলাহলের পরিসমাপ্তি ঘটায় সকলেই কিছু অবসর পাইয়া সুস্থির হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দিবাকরবাবুর অভাব সভ্যদের মনে উৎসাহ-হানির প্রভূত কারণ ঘটাইলেও, সংঘের সাধারণ কার্য এক-প্রকার চলতি ছিল। তবু, প্রতি কাজে তাঁহার অভাব অনুভব না করিয়া উপায় ছিলনা। প্রতিদিন বৈকালে সংঘের ঘরে তাহাকে ঘিরিয়া সভ্যদের যে আলাপ-আলোচনা হইত, তাহার মুখে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পৃথিবীর নানা রূপ রস বৈচিত্র্যের, দুঃখকষ্টের, আশা-আনন্দের যে-সব কাহিনী তাহারা শুনিত, তাহা আর জমিলনা। একটা থমথমে বিষাদের ছায়া যেন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর মহাত্মা গান্ধি, মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অকস্মাৎ গ্রেপ্তারে দেশময় হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন প্রায় তৃতীয় বৎসরে পড়িয়াছে, বিশ্বময়

দুর্যোগের মধ্যে ভারতের নেতৃবৃন্দ দেশের কল্যাণ কামনায় যে কর্মসূচী গ্রহণ করিতেছিলেন, বিদেশী শাসনকর্তা তাহা অপরাধজনক বিবেচনা করিয়া তাহাদের কারারুদ্ধ করিল। ফলে ভারতবর্ষময় প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

দূরদেশাগত বণিক শাসকের এই অন্যায়ের প্রতিবাদে সবুজসংঘের প্রতিটি প্রাণ উদ্যত হইয়া উঠিলেও তাহারা কী করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রতিদিন সংবাদ আসিতে লাগিল ইতঃস্তত বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের শোভাযাত্রার উপর লাঠিচালনা এবং গুলিবর্ষণের। এবং অকস্মাৎ একদিন সংবাদপত্রে পড়িল : দিবাকরবাবু এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতে যাইয়া নিহত হইয়াছেন।

যে-চাঞ্চল্য সবুজ-সংঘের ছেলেরা অন্তরে দমন করিয়া রাখিতেছিল, এইবার তাহা শাসনের সীমা ভাঙিয়া উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িল।

অনাচারের প্রতিবাদে সেদিনকার মতো অতো বিরাট—ক্ষুব্ধ তরুণদের মিছিল ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। পতাকা-হস্তে পথে পথে মুহুর্মুহু তাহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই।

সবিতা, মণিকা, পান্নালাল, বরুণ, মুনির, সুশীল প্রভৃতির নেতৃত্বে শহরের সমস্ত তরুণপ্রাণ রৌদ্রশ্রান্ত হইয়াও সতেজ-কণ্ঠে তারস্বরে বারংবার অন্তরের কামনা জানাইল : বিদেশীর অন্যায়-শাসনের অবসান হউক। সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক॥

তাহাদের জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন।

শোকের মুহ্যমানতায় তাহারা যেন দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিল।

রহমানসাহেব, বরুণের বাবা পরিমলবাবু তাহাদের শান্ত ও সংযত করিয়া বলিলেন,—এতোদিন তোমাদের সকল কাজে আমরা সানন্দে সমর্থন জানালেও আজ প্রথম নিরুৎসাহ করবো :—তোমাদের বীরপূজা সার্থক হোক, এ কামনা আমরা অবশ্যই করি। দিবাকরবাবুর মৃত্যুতে তোমরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছো জানি। কিন্তু তার জন্য উত্তেজিত হয়ে কিছু করা তোমাদের শোভা পায় না। সে কাজ দিবাকরবাবুর সহকর্মীদের। তোমাদের বয়স অল্প। অনেক কিছুই তোমরা জানোনা, বোঝোনা। আরো বড়ো হয়ে দেখবে অসংখ্য অন্যায় অনাচার আমাদের উপর ঘটছে। বড়ো হয়ে, সব বুঝে তখন তোমরা তার প্রতিবাদ কোরো, তাকে উচ্ছেদের সংকল্প নিও। আজ তোমরা শান্ত থাকলেই সবচেয়ে বিবেচনার কাজ হবে।

বিষাদমগ্ন কিশোরেরা তাঁহাদের উপদেশ মানিয়া লইল।

তাহারা আরো কহিলেন,—তোমরা যা চাইছো, তাকে সোজাকথায় বলা যায় রাজনীতি করা। কিন্তু এই বয়সে তা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আগে চতুর্দিকের অবস্থা উপলব্ধি করো—শেখো।—তোমাদের দিবাকরদা'ও আজ বেঁচে থাকলে এই কথাই বলতেন। আজ রাজনীতিতে

জড়িয়ে পড়লে তাঁর স্মৃতি-বিজড়িত এই সংঘকেও তোমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেনা।

সুতরাং সকলে ধীরভাবে তাঁহাদের নির্দেশ পালন করিল।

সংবাদপত্র ইতিমধ্যে বন্ধ হইয়া গেছে। কোথায় কী ঘটিতেছে জানিবার উপায় নাই। শহরেও কিছুদিন ধরিয়া নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ চলিতেছিল বটে, কিন্তু সংঘের ছেলেরা সর্বতোভাবে তাহা হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া রাখিল।

তবু কয়েকদিন পরে বরুণ লক্ষ্য করিল, সংঘে যেন ভাঙন শুরু হইয়াছে। আগের মতো আর সভ্যদের ভীড় নাই। সকলেরই উৎসাহ ক্ষীণ। ধীরে ধীরে অনেকেই দূরে সরিয়া গেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে পরীক্ষা নিকটবর্তী হইয়া পড়ায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আপাততঃ স্থগিত রহিল। বরুণ, কামাল প্রভৃতি জোর করিয়া মন হইতে অন্য সকল চিন্তা দূর করিয়া পড়ায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ভাসিয়া ওঠে দিবাকরবাবুর হাসিময় মুখচ্ছবি। অক্ষরে অক্ষরে গড়িয়া ওঠে তাহারই মুখের অজস্র কথা; অজ্ঞাতসারে তাহার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহারা তন্ময় হইয়া পড়ে।

কামাল কিছুতেই সে বেদনাকে মন হইতে দূর করিতে সক্ষম হইলনা। সর্বদা, এমনকী নিদ্রার মধ্যেও দিবাকরবাবুর

নানা-স্মৃতি তাহাকে ক্রমাগত চঞ্চল করিয়া তুলিতে লাগিল। মনে হয়, কী এক অসীম ভরসা লইয়া তিনি কোনো সুদূরদেশ হইতে তাহাদের দিকে তাকাইয়া আছেন, উজ্জ্বল চোখে তিনি বলিতেছেন বিদায়-দিনের সেই কথাগুলিঃ তোমাদের পাশে এসে দাঁড়াবার শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছি··· প্রতিদিন ভোরে ঘুম হইতে জাগিয়া কামাল তাহার উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিত,—তুমি আশীর্বাদ করো দিবাকরদা, তোমার সেই আশা যেন পূর্ণ করতে পারি।

পরীক্ষার শেষে বরুণ একদিন সকালে তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত। একখানা চিঠি কামালকে দিয়া কহিল,—সুশোভনবাবু হঠাৎ একটা চিঠি লিখেছেন, পড়।—

কামাল পড়িল :—প্রিয় কিশোরবন্ধুরা, তোমাদের কাছে এই চিঠি অনেক আগেই লেখা উচিত ছিলো, কারণ দিবাকর মৃত্যুর সময় তোমাদের নাম করেছিলো। সেকী বলতে চেয়েছিলো জানিনে—তার সংপূর্ণ কথা নিষ্ঠুর মৃত্যু শুনতে দেয়নি।

দিবাকরের মৃত্যুর খবর তোমরা পেয়েছো কিনা জানিনে। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এখানে সে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা পরিচালনা করছিলো,—তাতে পুলিশ বাধা দেবার ফলে গণ্ডগোল ঘটে এবং বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে, সেই অসংযত জনমণ্ডলীকে শান্ত করবার বৃথা চেষ্টার সময় পুলিশের গুলি অকস্মাৎ তার বুকে এসে লাগে। তক্ষুনি সে অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।—আমি তার তার পাশেই ছিলুম।

তাড়াতাড়ি তাকে দূরে টেনে নিয়ে ক্ষতস্থান বেধে মুখে জলের ঝাপটা দেবার পর তার জ্ঞান ফিরলো। তখনো তার হাতে পতাকা ধরা। মৃত্যুরও পরে পতাকাদণ্ডের সেই দৃঢ়মুষ্টি খুলতে বেগ পেয়েছি।...চোখ মেলবার চেষ্টা করে সে পারেনি। কী বলতে চেয়েছিলো বুঝতে পারিনি, তবু মনে হোলো হয়তো তোমাদের কথা। সে যে মরণকালে তোমাদের ভোলেনি সেইটুকু জানাতেই এই চিঠি লিখলাম। দিবাকরের দেশের বাড়িতে তারও মা-বাবা ভাইবোন সবই আছে। তারা এই সংবাদকে কীরকম গ্রহণ করছেন জানিনে—তবে খুব দুঃখ পাবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি—দিবাকর মরে গেলেও তার হয়ে অসংখ্য ছেলে আজ আপনাদের সন্তান হবার জন্য উদগ্রীব। আশা করি, তোমরা ভালো আছো,প্রীতি নিও—

তোমাদের স্থশোভনদা।

চিঠিখানা শেষ করিয়া কামাল বরুণের দিকে তাকাইল; বেদনাতুর দৃষ্টি মেলিয়া জানালা দিয়া সে বাহিরে তাকাইয়া আছে।

দুজনেই বহুক্ষণ নীরব রহিল।

অবশেষে বরুণ কহিল,—একটা সুখবর শুনেছিস?

—কী?

—স্কুলের কমিটিতে অভিভাবকদের প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য রায়বাহাদুর একটা সভা ডেকেছেন।

—হঠাৎ?

—অভিভাবকদের চাপের ফলেই আর কী!

এমন সময় বাহির হইতে সুশীলের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল,—কামাল আছিস?

কামাল সাড়া দিয়া তাহাকে আহ্বান করিল।

সুশীল পান্নালালকে লইয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল,—যা ভেবেছি তাই, হরিহরাত্মা বন্ধু দুজনকে একখানেই মিলবে। ওরে, ভারি একটা সুখবর আছে!

—কী?

দিবাকরবাবুর মৃত্যুর পর হইতে চঞ্চল বরুণও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চরিত্রে আর আগেকার সেই ব্যগ্র-চঞ্চলতা নাই। সে দিন দিন কেমন বিষণ্ন হইয়া উঠিতেছিল। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল,—কী?

সুশীল ধমকাইয়া কহিল,—শুধু 'কী'। ওরে এ খবর শুনে যে লাফিয়ে উঠবি! আচ্ছা বরুণ, সবসময় তুই আজকাল এমন বিষণ্ন হয়ে থাকিস কেন বলতো? যা হয়ে যাবার হয়ে গেছে! এখন কোথায় নোতুন উদ্যমে আমাদের কাজ চালাবো—তা তুই—

কামাল ইতিমধ্যে নিজের ছোট ঘরে রায়বাহাদুরের পুত্র পান্নালালকে বসিবার জন্য একটা ভাঙা মোড়া আনিয়া দিয়াছে। সুশীলের জন্য কিছু একটা আনিতে যাইতেই, সে তাহার হাত চাপিয়া বই ভরা কেরোসিন কাঠের টেবিলটার উপর বসিয়া কহিল,—তোর অত ব্যস্ত হবার কারণ নেই—ছাখ ঐ বরুণের কাণ্ড, কী রকম গোমরামুখে—

বরুণ হাসিয়া ফেলিল,—পাগল! হয়েছে, থাম! এবার কী সুখবর বল ?

সুশীল মাথা নাড়িয়া কহিল,—উঁহু, বল, আর কখনো মন খারাপ করে থাকবোনা, নইলে বলছিনে!

—আচ্ছা থাকবোনা। এবার থেকে তোর সংগে হৈ হৈ করে হাসবো! কিন্তু ভাই সাধে কী হাসতে পারিনি, এই দেখ—পড়—বরুণ তাহার হাতে সুশোভনবাবুর চিঠিখানা তুলিয়া দিল।

সুশীল পড়িয়া কহিল,—হুঁ দেখলাম। কিন্তু এতে মন খারাপ করার কী আছে? বীরের মতো তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, যে আদর্শ নিয়ে তিনি নির্ভীকচিত্তে মরতে পেরেছেন, বিমর্ষ হয়ে না থেকে আমাদেরো সেই আদর্শ গ্রহণ করে মন শক্ত করা উচিত। দিবাকরদা নেই, কিন্তু তার জন্য সবাই মিলে এখন কাঁদতে বসবো সেটা কোনো কাজের কথা নয়, তাতে তাঁর অসম্মান করা হয় বলে আমি মনে করি। তোর কী মনে হয় তিনি মরে গেছেন, চিরদিন তিনি আমাদের মনে মনে বেঁচে থাকবেন না?—শেষের দিকে সুশীলের কণ্ঠস্বরও ভারি হইয়া আসিল।

বরুণ তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া উজ্জ্বলমুখে কহিল,—ঠিক বলেছিস ভাই! তোর মতো আমাদেরো শক্ত করে তোল!

সুশীল বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইল,—দিবাকরদাকে আমিও কী কখনো ভুলতে পারবো!

হঠাৎ তাহার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বরুণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বেশ আনন্দের মেজাজে আসিয়াছিল সুশীল, এই প্রসংগটা তোলা আবার উচিত হয় নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল,—না ভাই, যাক ওকথা, তুই সুখবরটা কী বল?

কিন্তু সুশীলের মুখে আর সে আনন্দ উজ্জ্বলতা ফিরিয়া আসিলনা। বলিল,—ঐ পান্নার মুখ থেকে শোন।

—না, তুই-ই বল, নইলে বুঝবো আমার উপর রাগ করেছিস!

—দূর পাগল!—বলিয়া সুশীল হাসিতে চেষ্টা করিল।

কামালের মা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকিলেন; বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—ওমা! আমার আঁধার ঘরে যে আজ একসাথে এতগুলো চাঁদ, ব্যাপার কী!

তাহাকে দেখিয়া সুশীলের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া বলিল,—চাঁদ না বাঁদর তা খাবার ঘরে যেয়ে উৎপাত করলেই বুঝতে পারবেন মাসীমা!

কামালের মা হাসিয়া কহিলেন,—তা আমি জানি যে তুই খুব পেটুক!

সকলে সে মন্তব্যে হাসিয়া উঠিল।

প্রত্যেকেই কামালের বাড়িতে পরিচিত। কামালের মা তাহাদের এটা ওটা নানা প্রশ্নাদি করিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—আমাকে না জানিয়ে যেন কেউ যেয়োনা।

সুশীল রহস্যময় হাসি হাসিয়া কহিল,—তা বুঝতে পেরেছি কেন! আশ্বস্ত হবার এতোটা ইশারা পেয়ে আমি তো কোনো মতেই যাচ্ছিনে!

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

বরুণ কহিল,—যাক, তুই এইবার বল দিকি কী সুখবর?

—ও—সুশীল আবার পূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইয়া কহিল, —রায়বাহাদুর ম্যানেজারকে তাড়িয়ে দিয়েছেন!

—মানে?—বরুণ চমকিয়া উঠিল।

—রায়বাহাদুরের আয় ব্যয় ইত্যাদি সবরকম হিসাবের ভার তো ম্যানেজারের হাতে? তা কাগজ পত্রে কী সব গণ্ডগোল করে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে দেবার মতলবে ছিল। রায়বাহাদুর তো কাগজপত্র নিজে বিশেষ দেখেন না, হঠাৎ কী রকম সন্দেহ হতে, দেখতে গিয়েই ধরা পড়লো!

—তারপর?

—তারপর আর কী, সংগে সংগে বরখাস্ত। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে পুলিশে দিতে পারতেন। কিন্তু সে বেচারা কেঁদে পা জড়িয়ে ধরলে, তাছাড়া আত্মীয়ও তো তার! তাই ছেড়ে দিলেন।

—তুই জানলি কী করে?

—ঐ পান্না বললে।

ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস হইতেছিল না। রায়বাহাদুরের কুগ্রহটা তাহা হইলে সত্যই খসিয়াছে!

—কিন্তু ম্যানেজার চুরি করেছিলো কেন ?

পান্নালাল বলিল,—বাড়ি কেনবার জন্মে। বাড়ি করার মোহে পেয়েছে ওকে। ঐ বস্তী উঠিয়ে তো ওখানেই একটা বাড়ি করবার মতলব ছিলো তার।—

কামাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—যাক, বস্তীর লোকগুলো বেঁচে গেলো। আর ওদের বোধ হয় উঠে যেতে হবেনা। সংবাদটা ওদের জানানো দরকার!

সুশীল কহিল,—সে আমি তক্ষুণি জানিয়ে এসেছি। এতোক্ষণে তাদের মধ্যে উৎসবের ধূম পড়ে গেছে!

—খবরটা শুনে হেডমাষ্টার মশাইও খুব খুশি হবেন।

—তাঁকেও জানিয়ে এসেছি। যারা যারা খুশি হবে তাদের কাউকে বাকি রাখিনি—কেবল দিবাকরদা' ওর শেষ পরিণামটা দেখে যেতে পারলেন না।

আবার সেই বিমর্ষ আবহাওয়া আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি প্রসংগটা বদলাইয়া কহিল,—সংঘের কাজকর্ম অনেকদিন কিছু হচ্ছেনা। আলোচনা করে কিছু—

বরুণ তাড়াতাড়ি কহিল,—হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। মা আজ বলছিলেন, ভাই ফোঁটার দিন সামনে, সংঘে আমরা যেন ঐ উৎসবটা পালন করি।

—বেশ তো! তা খুবি ভালো হবে।—সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

শামিম এই সময় তাহাদের জন্ম কিছু খাবার লইয়া আসিল।

সুশীল তাহাকে দেখিয়া কলরব করিয়া উঠিল,—সুস্বাগতম। সুমিদি সুস্বাগতম। আমরা এতোক্ষণ তোমারি প্রতীক্ষা করে ছিলাম।

শামিম হাসিয়া কহিল,—সুশীল আজকাল একটু বেশি ফাজিল হয়েছে না রে বরুণ?

সুশীল ততোক্ষণে খাবারগুলি মুখে পুরিতে পুরিতে কহিতে লাগিল,—যতোই অভিযোগ করো সুমিদি, এগুলো সাবাড় না করে কোনো উত্তর দেবার ইচ্ছে নেই। সময়ো নেই।

সকলে হাসিয়া উঠিল। পান্নালাল বিষম খাইল।

হট্টগোল শেষ হইলে বরুণ কহিল,—তোমাকে কিন্তু আমাদের ভাইফোঁটা উৎসবে যেতে হবে সুমিদি।—

শামিম খুশি হইয়া কহিল,—বেশ যাবো।—পরক্ষণেই কামালের দিকে ফিরিয়া কহিল,—তোকে বলতে ভুলে গেছি, কাল বিকেলে পূরবী এসেছিলো, ভাইফোঁটার দিন তোকে যেতে বলেছে খুব করে।

পূরবীদের বাড়ির সেই ব্যাপারটা কামাল বরুণকে জানাইয়াছিল। সে হাসিয়া কহিল,—তার চেয়ে পূরবীদিকে আমাদের সংগে ডেকে নোবো। কামাল একলা ফোঁটা পাবে, আর আমরা পাবোনা তা হতে দেবো কেন?

কামালের মা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কলিলেন—আমার আসতে দেরি হয়ে গেলো। কে যেনো বিষম খেলো শুনলাম?

শামিম কহিল—পান্নালাল। ঐ সুশীলটা হাসাচ্ছিলো।

কামালের মা আশ্বস্ত হইলেন। পান্নাকে কহিলেন,—গরিব মানুষ বাবা, কী তোমাদের খেতে দেবো আর—

পান্নালাল লজ্জিতমুখে তাড়াতাড়ি তাঁহা কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—কী খেতে দিলেন সেটা বড়ো কথা নায়, খাবারের চাইতে আপনার স্নেহের উপরেই আমাদের দাবি বেশি!

কামালের মা খুশি হইয়া উঠিলেন—

ছেলেরা উঠিল।—আসি মাসীমা আজ।

—আচ্ছা। এসো মাঝে মাঝে!—তুইও কী বেরোচ্ছিস কামাল?

—হ্যাঁ মা, এক্ষুনি ফিরবো।

সকলকে সাথে লইয়া কামাল বাহির হইয়া পড়িল।

সংঘের ঘরে সভ্যদের সঙ্গে দিবাকরবাবুর একখানা ছবি ছিল। ভাইফোঁটার দিন সকল মেয়েরা প্রথমে তাহার কপালে ফোঁটা আঁকিয়া অনুষ্ঠানের সূচনা করিল। সবিতা ফোঁটা দিতে দিতেই ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইল!

দিবাকরবাবু চলিয়া যাইবার পরে, না জানাইয়া যাওয়ার জন্য সবিতা প্রথমটা তাঁহার উপর অভিমান করিয়াছিল, বলিয়াছিল,—আসুন একবার দিবাকরদা, এমন বকুনি বকে দেবো! কিন্তু যেদিন তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আসিল, সেদিন উচ্ছ্বসিত জলধারা তাহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। —পরে শোকাবেগ দমন করিয়া সে-ই পতাকা হস্তে পথে পথে বিদেশী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তরাবেগকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে।

প্রতিটি ছাত্রের সহিত, পরিচিত প্রত্যেকটি কিশোর কিশোরীর সহিত, দিবাকরবাবুর অন্তরের নিগূঢ় সংপর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু সবিতা বা বরুণ, বা কামাল নয়, প্রত্যেকটি সংঘ-সভ্য তাঁহার কথা স্মরণ করিলে বিষাদমগ্ন হইয়া পড়ে।

সেদিনকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছিলেন পরিমলবাবু। তাঁহার আমন্ত্রণে রহমানসাহেব কিছু বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন এমন সময় দ্বারপ্রান্তে ব্যস্ত উদভ্রান্ত ভাবে একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইল—

রহমান সাহেব তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কী সংবাদ আনোয়ার?

আনোয়ার হাঁপাইয়া কহিল, শহরের উত্তরদিকে একটা পল্লীতে তুচ্ছ একটা ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দুমুসলমানে প্রায় দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।

সকলে অস্ফুট চিৎকার করিয়া উঠিল।

রহমান সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। বরুণ, কামাল প্রভৃতিও কাহারও নিষেধ না মানিয়া তাঁহার পিছু পিছু ছুটিল।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। কথাটা গত বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে আরেকবার সারা শহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিমা লইয়া কোনো মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইবার সময় মুসলমানেরা বাধা দেয়।—বাজনা থামাইয়া যাইতে হইবে। হিন্দুরা তাহাতে রাজী হয় না, বলে—বাজনা বাজাইয়া শোভাযাত্রা লইয়া যাইবার অনুমতি আমরা পাইয়াছি, তাহা ছাড়া বরাবর এপথে প্রতিমা লইয়া গিয়াছি—কই, কোনো কথা তো ওঠে নাই।—ক্রমে সুরু হয় বচসা এবং ব্যাপারটা গুরুতর আকার ধারণ করে। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া প্রতিমাবাহীদের বাজনা থামাইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তখনকার মতো গণ্ডগোলটা মিটিয়া গেল।

কিন্তু দীর্ঘদিন পরে সেই কথার আলোচনা লইয়াই একজন হিন্দু ও মুসলমানে বচসা হইবার ফলে, পরিস্থিতি বর্তমানে দাঙ্গার পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দূর হইতে ঘটনাটা শুনিয়া রহমান সাহেব ঝগড়ার স্থানে আগাইয়া গেলেন।

সেখানে দারুণ ভীড়। উভয় পক্ষে অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ আসিয়া যোগ দিয়াছে। উত্তেজনায় তাহারা

অধীর। মুহুমুহু 'বন্দেমাতরম' আর 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

এপক্ষে আসিয়াছেন ইউসুফ উকিল, ওপক্ষে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান বিদ্বেষী তিনকড়ি বাবু। তাহাদের উসকানিতে তখন প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছে।

রহমান সাহেব দুইদলের মাঝখানে পৌঁছিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই মারামারি সুরু হইয়া গেল।

ভীড়ের মধ্যে বরুণ, কামাল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার পরই অকস্মাৎ জনতা দুইদিকে ছুটিতে সুরু করিল। মুহূর্ত মধ্যে রাস্তা প্রায় ফাঁকা হইয়া গেল। কামাল যাতনার চিৎকার শুনিয়া চাহিয়া দেখিল রহমান সাহেব এবং আরো দুই তিনজন লোক রক্তাক্ত দেহে পথের উপর লুটাইতেছেন।

চিৎকার করিয়া সে পিতার নিকট ছুটিয়া গেল। পথ আর তখন নিরাপদ নয়, তবু মূর্ছিত পিতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া তাহার আহত স্থানের দিকে চাহিয়া কামালের বাহ্যজ্ঞান যেন লুপ্ত হইয়া গেল।

পেট কাটিয়া রহমান সাহেবের অন্ত্রাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। জামাকাপড়ে, পথে রক্তের ঢেউ। কামাল শিহরিয়া চক্ষু মুদিল। সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া বার দুই ব্যাকুলস্বরে এদিক ওদিক চাহিয়া বরুণকে ডাকিল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা, কামাল অদূরে দণ্ডায়মান একটা গাড়ি আহ্বান করিয়া, গাড়োয়ানকে প্রচুর ভাড়া

কবুলাইয়া বহুকষ্টে তাহার পিতা এবং অন্যান্য দেহগুলি গাড়িতে তুলিল। তাহাদের একটি দেহ দেখিয়া সে আবার চিৎকার করিয়া উঠিল,—তাহা বরুণের! পৃষ্ঠে ছুরিকাহত হইয়া সে-ও মূর্ছিত।

কামাল যেন দিগ্‌বিদিক হারা হইয়া গেল। আহত দেহে গাড়ি ভর্তি। সে কোনপ্রকারে গাড়োয়ানের কাছে উঠিয়া কহিল,—চলো হাসপাতাল। শিগ্‌গীর—

রহমান সাহেবের আর জ্ঞান ফিরিল না। হাসপাতাল হইতে সংবাদ পাইয়া তাহার ও বরুণদের বাড়ির সকলেই পথের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া হাসপাতালে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদের সমক্ষে সন্ধ্যার দিকে রহমান সাহেবের মৃত্যু হইল।

সে মৃত্যু মর্মান্তিক। কামালের মা শোকে মূর্ছিতা, শামিম কাঁদিয়া আকুল; শুধু একমাত্র কামালই প্রবল চিত্তে নিজের অন্তরাবেগকে দমন করিয়া শূন্যচোখে পিতার মৃতদেহের দিকে চহিয়া রহিল।

কাঁদিল সে-ও, বুকভাঙা কান্নাকে সে-ও শেষ পর্যন্ত দমিত করিয়া রাখিতে পারিল না, কিন্তু সংগে সংগে এক দুরন্ত সংকল্পে সে ধীরে ধীরে শক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল দিবাকরবাবুর কথা: মানুষে মানুষে কোনো প্রভেদ নেই কামাল। ধর্মের ছদ্ম আবরণে, আজ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যদি হানাহানি করে তাতে কুচক্রীরই চক্রান্ত আছে বুঝবে। সেই কুচক্রীর উচ্ছেদ করতে হবে।

মৃত পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শোক-শীতল কিশোর নোতুন করিয়া আবার সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল।

দিবাকরবাবুর মৃত্যু তাহার চোখে এক নোতুন জগৎ খুলিয়া দিয়াছিল। কোন অপরাধ ছিল না তাঁহার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া তাঁহার জীবনান্ত ঘটিল। তিনি যে দুনিয়ার স্বপ্ন দেখিতেন তাহা মানুষে মানুষে ভালোবাসার এক পবিত্র স্বর্গ। কুচক্রীর স্বার্থের প্রয়োজনেই তাহা কাম্য নয়।

রহমান সাহেবের মৃত্যুও সেই ধরণের। তিনিও দিবাকর বাবুর মতো এক প্রীতিময় দুনিয়ার স্বপ্ন দেখিতেন, অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া তিনি প্রাণ দিলেন। তাহার মৃত্যুও কামালের সম্মুখে যেন আরো এক নোতুন জ্ঞান বহন করিয়া আনিল।

কেন এই হানাহানি? কেন তুচ্ছ স্বার্থ লইয়া হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আঘাত করিল? যাহারা আঘাত করিয়াছে, তাহারা নির্বোধ। হিন্দু আজ মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে পরস্পর শত্রু বলিয়া ভাবে, কারণ আসল শত্রুকে উহারা জানে না। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই আজ কুচক্রীর দলের লোক রহিয়াছে—জনসাধারণের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ লইয়া তাহারা একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতেছে। যে ঘটনা লইয়া এই দাঙ্গার সুরু তাহা অতি তুচ্ছ। মসজিদের

সম্মুখ দিয়া বাদ্যভাণ্ডের শোভা-যাত্রা গেলে মুসলমানের ধর্ম নষ্ট হয়, এমন কথা কোনো ধর্মগ্রন্থে নাই। আবার বাজনা বন্ধ করিয়া গেলেও যে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হয়, তাহাও নয়। তবু দুষ্টবুদ্ধি চালিত হইয়া এই সব সামান্য কারণকে উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়িয়া উঠে। কাহারও সহনশীলতা নাই। স্বচ্ছ দৃষ্টিভংগি লইয়া কেহই এই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইয়া আসে না। অন্ধ কুশিক্ষিত জনসাধারণ ধর্মের নামে গোঁড়ামীর অন্ধতায় উন্মত্ত হইয়া উঠে। অথচ প্রত্যেক ধর্মেরই সার কথা ঃ মানুষ হও। কিন্তু মজার ব্যাপার এই মানুষ হওয়া দূরে থাকুক, ধর্মপালনের নামে সকলে নিছক হিন্দু আর মুসলমানই হইয়া রহিয়াছে!

আরো দুঃখের কথা, এই অন্ধতার জন্যই আজ এক বিদেশী শাসকশক্তি আমাদের পদানত করিয়া রাখিয়াছে। নিয়ত দুঃখ দারিদ্র্যের ভারে প্রতিটি ভারতবাসীর চক্ষুতে আজ নিরাশার অন্ধকার—সে অন্ধকার দূর করিবার কোনো চেষ্টাই এই শাসকদের নাই। বণিক-স্বার্থের প্রয়োজনে আজ তাহারা ভারতভূমির উপর চাপিয়া বসিয়াছে, অধিবাসীদের মংগল করার অর্থ তো তাহাদের শোষণ বন্ধ করিয়া ভারত ত্যাগ করিয়া যাওয়া! যাইবার কথা উঠিলেই তাহারা দেখাইয়া দিবে হিন্দু মুসলমানের বিভেদ। আমরা তো সুশাসনের জন্যই আছি। ধীরে ধীরে তোমাদের স্বাধীন করিয়া দিব—আগে নিজেদের সংশোধন কর। উপযুক্ত হও।

স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিলেই তাহাদের এই উপদেশ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

আসলে এই অনৈক্যের পশ্চাতে যে তাহাদেরই চক্রান্ত রহিয়াছে তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়; বক-ধার্মিকদের আসল স্বরূপটা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বৈদেশিক প্রভু আজ নিজের প্রভুত্বের জন্যই সুকৌশলে এক সম্প্রদায়ের পিছনে অন্যকে লেলাইয়া দিতেছে। সেই বিড়ালের পিঠা-ভাগের গল্প মনে পড়িল কামালের। আমরা নির্বোধ বলিয়াই এখন পর্যন্ত বর্তমান তাহার অন্যায় অবস্থিতি।

পৃথিবী ব্যাপিয়া রাজ্য লইয়া রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছে। এক দেশের মানুষ ধনিক স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া অপর দেশের জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণের জন্য নির্বিচারে তাহাদের পশুর মতো বধে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে···রজনীর অন্ধকারে আকাশচারী বম্বোদর বিমান সুষুপ্ত নগরীর উপর ধ্বংসাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতার—নিরপরাধ উলুখড়দের জীবনসংহার করিয়া জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার মুখে কালিমা লেপন করিতেছে···

এই ধ্বংসযজ্ঞে ভারতবর্ষ উদাত্তস্বরে শান্তির রব তুলিয়াছিল ···মহাপুরুষ দেশনায়কদের কণ্ঠে একযোগে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—অন্যায়ের অবসান চাই···দানবে দানবে এই যুদ্ধে আমাদের এক পাই নয়, এক ভাই নয়।...

ধ্বংসের ও হিংসার এই দ্বন্দ্বে, যে দ্বন্দ্বে 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে

সংঘাত, লোভে লোভে, ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পংকশয্যা হতে,—তাহার সহিত ভারতবর্ষ নিজেকে জড়াইতে চায় নাই, প্রতিবাদ জানাইয়াছে, কিন্তু বিদেশী রাষ্ট্ররথীরা তাহাতে কর্ণপাত করে নাই···দেশের যাহারা বরণীয়, যাহারা পূজনীয়, স্মরণীয়, তাহারা আজ সকলেই কারাগারের অন্তরালে··· তাহাদের চোখে ছিল এই দেশের—জগতের মানুষের মুক্তির স্বপ্ন। স্বার্থান্ধী সে স্বপ্ন মুছিয়া দিতে চাহিতেছে···সে আজ 'ন্যায়েরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়···'

যাঁহাদের স্থান আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনগণের অন্তরে, আজ বিদেশীর হাতে তাহাদের এই লাঞ্ছনা আমাদেরই নির্বুদ্ধিতার জন্য···

এই কুশিক্ষা ও ধর্মান্ধতা দূর করিতে না পারিলে বন্ধ হইবে না এই হানাহানি, শেষ হইবে না পরস্পরের বুকে এই ছুরিকাঘাতের। তাহার জন্য চাই সহানুভূতিশীল উপযুক্ত ন্যায়সম্মত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—কামালের চিন্তা এই ভাবে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়া চলিল।

প্রায় তিনদিন ধরিয়া সহরের সর্বত্র এই উন্মত্ত হানাহানি চলিতে লাগিল। কামাল ভাবিয়া দেখিল, ইহাকে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলাও ভুল। কতকগুলি গুণ্ডা এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকের মধ্যেই এই জঘন্য মারামারি চলিতেছে; কিন্তু ইহাতে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে—ক্রমে ভদ্র ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও বিদ্বেষভাব

প্রসারলাভ করিতেছে। অসীম দুঃখ ও বেদনায় তাহার মন পরিপ্লুত হইয়া গেল। দেশময় প্রতিটি জীবনের সম্মুখে আজ অজস্র দুঃখদারিদ্র্যের স্রোত, কোন সুদূর দেশে যুদ্ধ বাধিবার দরুন দিনের পর দিন, অভাব ও দৈন্য অনুভব করিয়া প্রতিটি জীবন দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইবার উপক্রম—এমন সময় এইরূপ হানাহানি চলিতে থাকিলে দুঃখনাশের উপায় করিবে কাহারা?

অবশেষে চতুর্থ দিনে শহরের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হইয়া আসিল। সশস্ত্র সৈনিক পথে পথে পাহারা দিয়া শহরের অধিকাংশ গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করিয়া শান্তি শৃংখলার বিধান করিল।

এ কয়দিন বাড়ি হইতে কাহারও বাহির হওয়াও অসম্ভব ছিল। পথে লোক-চালাচল দেখিয়া, কামাল আর কালবিলম্ব না করিয়া বরুণদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হইল।

অকস্মাৎ উদ্বেগ ও ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দাঙ্গাটা ঘটিয়া গেল। শহরের গুণ্ডাগুলি সম্প্রদায়ের নামে, ধর্মের নামে এ উহার দোকানপাট লুট করিল, নীচ মনের হিংসা লইয়া এ উহাকে নিহত করিল, মন্দির ভাঙিল, মসজিদ ভাঙিল— ইহাতে কাহার ধর্ম কতটুকু গৌরবান্বিত হইল?

দিবাকর বাবু বলিতেন,—স্বাধীন দেশে এই সব হাংগামা কখনো হয় না কামাল। আজ হিন্দু-মুসলমান যদি বুঝতো পরস্পরের সুখদুঃখ পরস্পরের মিলিত চেষ্টার দ্বারাই দূর হয়,

তাহলে এই সব তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে আর নিজেদের মধ্যে কখনো দলাদলি হোতো না। এই সব দাংগাহাংগামা হচ্ছে অসন্তুষ্ট মনের বিক্ষোভ। এই অসন্তোষ যে কার বিরুদ্ধে তা-ই এরা পরিষ্কার বুঝতে পারে না। সেইটাই আজ বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

রহমানসাহেবও ঠিক ইহাই বলিতেন,—হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা বাধে কুচক্রীর চক্রান্তে। কুচক্রী যখন থাকবে না—এই বিরোধেরও তখন অবসান হবে। আর তাছাড়া বাস্তবিক যারা ধর্ম পালন করে তারা তো কখনো তুচ্ছ হানাহানিতে মত্ত হয় না। ধর্মের নামে দাঙ্গা ঘটায় অমানুষেরা। তাদের কেবল ঘৃণা নয়, মানুষ করে তুলতে হবে!—

শোকস্তিমিত নয়নে কামাল কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে পথ অতিবাহন করিয়া চলিল।

এই চারদিনে সকলের উপর দিয়াই যেন একটা দুরন্ত ঝড় বহিয়া গিয়াছে। দাঙ্গার আতংকে কেহ পথে বাহির হইতে পারে নাই, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়জন এমন কি প্রতিবেশীরও সংবাদ লইতে পারে নাই।

বরুণকে সেই হাসপাতালে লইয়া যাইবার পর, আরেকদিন পান্নালালদের মোটরে বরুণদের বাড়িতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যাওয়া ছাড়া কামাল তাহার আর কোনো সংবাদ পায় নাই। সেদিন আসিবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না, যদি পান্নালাল তাহাকে আহ্বান করিয়া না নিত। রায়বাহাদুর

সেদিন স্বয়ং তাহাদের বাড়ি আসিয়া সকলকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন ; সেই মোটরেই আবার বরুণদের বাড়ির সকলেও আসিল।—পরিমলবাবু কামালের মাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, —কেঁদোনা বোন, আদর্শবাদী রহমানের মৃত্যু ঘটেনি। যেমন মরেনি দিবাকর। উন্মত্তেরা দেখেনি তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রতীক। তাকে হত্যা করলেও তার আদর্শ চিরকাল বেঁচে থাকবে—বেঁচে থাকবে ঐ ছেলে কামালের মধ্যে।— শোকমলিন ঘরে বসিয়া উদ্বেগঅন্তরে তিনি এবং আরো অনেকে হয়তো অনেক কথা তাঁহাকে, শামিমকে, তাহার মাকে বলিয়াছিলেন—তাহা সব মনে পড়ে না। দাঙ্গা, পিতার মৃত্যু—এই সব ঘটনাই একটা ঝাপসা আবছা দুঃস্বপ্নের মতো বোধ হয়। সেই দুঃস্বপ্নের কথা স্মরণ করিলেই মন কী রকম ফাঁকা বিষন্ন হইয়া পড়ে। বরুণদের বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়া কামাল আবার ভাবিল, মাত্র অল্পদিনের আলাপেই রহমানসাহেব এবং পরিমলবাবুর মধ্যে গভীর বন্ধুতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। রহমান সাহেব কাহারও তুলনায় ধর্ম কম মানিতেন না, পরিমলবাবুও ধর্মের বিধান পালন করিয়া চলিতেন। তবু তো দুই ধর্ম প্রীতির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে নাই! কামালের মনে হইল, নিজ বিবেকের জ্ঞান ও হিতকামনার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে মানব প্রেম, তাহার তুলনায় অন্য কোনো বড়ো ধর্ম নাই, সকল ধর্মেরই হয়তো তাহাই মূল কথা···অন্যায় হইতে, অশুভ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তো ধর্ম···চণ্ডীদাসের কথা মনে পড়িল

তাহার—শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!—এই উপলব্ধি মানুষকে পরিচালনা করিলে জগৎ স্বর্গে পরিণত হইত।…

রবীন্দ্রনাথ কল্পনা করিয়াছেন 'ভারত-তীর্থের'……অযূত সম্প্রদায় যেখানে দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে…মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখর প্রতিটি প্রাণ মানব-প্রেমের ডোরে পরস্পরের বন্ধনে মিলিত হইয়া এই ধূলার ধরণীকেই স্বপ্নের স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলিবে…আসিবে, সেদিন আসিবে!…

সমস্ত বাড়িতেই কেমন একটা বিষণ্ণ ছায়া। চতুর্দিক যেন থমথম করিতেছে। বরুণের মা একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, কামালকে দেখিয়া তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; ভারীগলায় কহিলেন,—এই যে বাবা তুমি এসেছো! আজ দুদিন ধরে বরুণ জ্ঞান হলেই কেবল তোমারি নাম করছে!

কামাল আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আঘাতের পর প্রথমবার মূর্ছা ভাঙিবার পরেও নাকি বরুণ প্রথম তাহারই নাম উচ্চাচণ করিয়াছিল! দুরন্ত শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যেও সে তাহাকে বিস্মৃত হয় নাই!

কিন্তু সংগে সংগে বরুণের মা'র মুখভাব দেখিয়া মনে মনে সে শংকিত হইয়া উঠিল। এই কয়দিনে তিনি যেন একেবারে

ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। বেশবাস আলুথালু—দুই চক্ষু ফোলা, সারামুখে দুশ্চিন্তার কালিমা। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক কমনীয় সৌম্যভাব যেন দুঃখে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। অস্ফুটকণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল,—ও কেমন আছে মাসীমা?

আজ দুদিন ধরে অবস্থা খুবি খারাপ।—

—ডাক্তার কী বলছে?

—শহরের সব বড়ো বড়ো ডাক্তার আনিয়েছি। কিন্তু তারা কেউই খুব ভরসা দিতে পারছেন না।—বলিয়া উদগত অশ্রু চাপিয়া কামালকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তিনি আবার কহিলেন, সেদিন পথ থেকে যাকে তুলে আনলে কামাল, হয়তো আর তাকে ধরে রাখতে পারবে না—বলিতে বলিতে তাঁহার দুইগণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। খানিকপরে আত্মসংবরণ করিয়া কামালকে লইয়া বরুণের ঘরে আসিলেন।

বরুণ পাশ ফিরিয়া নার্সের হাত হইতে কমলালেবু খাইতেছিল। শিয়রের কাছে সবিতা উপবিষ্ট। আর দূরে জানালার কাছে বসিয়া পরিমলবাবু একটা বই হাতে বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিলেন। সকলেই উদভ্রান্ত।

বরুণ আশ্চর্যরকম পাণ্ডুর। তবু কামালকে দেখিয়া উজ্জ্বলমুখে তাহাকে পাশে বসিতে ইংগিত করিল—আনন্দে চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল—ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, —তোর কথা এতো মনে করেছি।

কামাল বসিয়া বন্ধুর হাতখানা নিজের হাতে তুলিয়া লইল, আবেগ সংযত করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল,—হাংগামায় আসার উপায় ছিল না ভাই—

বরুণ তাহার হাতখানা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া ধীরে কহিল,—জানি। কাকাবাবুর মৃত্যুসংবাদো শুনেছি। ভেবে-ছিলাম তুইও হয়তো খুব মুসড়ে পড়েছিস সেজন্য আরো দুঃখ পাচ্ছিলাম। ভেবেছি, কাছে থাকলে হয়তো সুশীলের সেই কথাগুলো স্মরণ করে তোকে সান্ত্বনা দিতে পারতাম। জানি, কাকাবাবুর মৃত্যু তোদের সকলেরি মনে খুব বাজবে, তবু সকলেই বলছে সে মৃত্যু গৌরবের—কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল তাহার, কামাল লক্ষ্য করিয়া সস্নেহে কহিল,—ও কথা থাক এখন ভাই,—কেমন আছিস বল?

বরুণ হাসিল,—দেখেও বুঝতে পারছিস না? কিন্তু মরণেও আমার দুঃখ নেই ভাই, আমি দিবাকরদা'র অনুসরণ করেছি! বলিতে বলিতে তাহার স্তিমিত দৃষ্টিতেও এক অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিল।

কামাল তাহা দেখিয়া ভয় পাইল, তাড়াতাড়ি কহিল,—যাঃ, বাজে চিন্তা করিসনি, দেখিস তুই সেরে উঠবি!—

বরুণ কোনো উত্তর করিল না। আবার চক্ষুর কোন বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কামাল তাহা মুছাইয়া তর্জন করিয়া কহিল,—তুই এমন করবি তো, আমি চলে যাবো। বরুণ করুণ হাসিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল।

ইহার পর দুইবন্ধুতে ধীরে ধীরে আলোচনা না হইলো এমন কথা নাই। পরিমল বাবু বরুণকে খুসি মনে কথা কহিতে দেখিয়া, যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল, কাছে আসিয়া কহিলেন,—জ্ঞান হবার পর এই প্রথম ওকে একটু তাজা দেখছি কামাল। তুমি ওর কাছ থেকে যেয়োনা। আমি কলকাতা থেকে ভালো ডাক্তার আনাবার ব্যবস্থা করি।

তিনি চলিয়া যাইবার পর সবিতা সাশ্রুনয়নে বলিল,—জানো কামালদা. দাদাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর থেকে বাবা আর এঘর থেকে নড়েননি! নাওয়া খাওয়া তো সকলেরি বন্ধ, কেবল মা-ই একটু স্থির আছেন সকলের চেয়ে।

বরুণ ম্লান হাসিয়া অভিযোগ করিল,—তুইও তো আর আমার শিয়র থেকে উঠছিসনা। জানিস কামাল, এই পাগলীও আমার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেছে! এতো বলছি তুই খেয়ে আয়, এর মধ্যে আমি মরবোনা, তা কিছুতেই শুনছেনা!—

কামাল হাসিয়া সবিতাকে বলিল,—আচ্ছা তুমি এখন যাওনা সবিতা, আমি ওর কাছে রয়েছি, তুমি খেয়ে এসোগে!

মৃদু আপত্তি করিয়া অবশেষে তাহার পীড়াপীড়িতে সবিতা উঠিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোক। জানালা দিয়া নজরে পড়ে দূর আকাশে চক্রাকারে চিল আর শকুনের সঞ্চরণ। সেই

দিকে চাহিয়া বরুণ, জিজ্ঞাসা করিল,—সবুজসংঘ তো এখন বন্ধ, না রে ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু সংঘকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। কোনমতেই তাকে বন্ধ হতে দেওয়া চলবে না। জানিস কামাল আমি ভেবে রেখেছি—যদি ভাল হয়ে উঠি তাহলে—

কামাল তাহার কথা বলিবার কষ্ট অনুমান করিয়া বাধা দিল,—আচ্ছা, সেসব কথা পরে শুনবো, আগে তুই ভালো হয়ে ওঠ।

বরুণ তাহার কথা মানিয়া চুপ করিল। জানালা গলাইয়া দৃষ্টি প্রেরণ করিল বাহিরের রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে। বাড়িঘর গাছপালা সব প্রখর রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। অধিকক্ষণ সেদিকে সে তাকাইয়া থাকিতে না পারিয়া চক্ষু মুদিল।

সবুজসংঘকে জীবিত রাখিতেই হইবে। সংঘের প্রতিটি সভ্যকে নোতুন করিয়া ব্রত লইতে হইবে মানুষের কল্যাণের। অন্যায়, কুসংস্কার, সকল অমানুষিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞায় প্রতিটি সভ্যকে উদবুদ্ধ করিতে হইবে, সংগে সংগে জনসাধারণেরও। দেখাইতে হইবে শুদ্ধ পবিত্র এক মহামিলনময় পৃথিবীর পথ……তাহারা মৃত জীবনে আনিবে প্রাণ…… দুঃখের অমানিশা ছিন্ন করিয়া দেখাইবে নোতুন সূর্যের আলোক……বরুণ মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিল—স্বাধীনতা সাম্য ও শান্তির পতাকা লইয়া সবুজসংঘ অনন্ত বিপদ বাধা

অতিক্রম করিয়া ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে··· লক্ষ্য এমন এক পৃথিবী যেখানে স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব নাই, মানুষে মানুষে ঘৃণা নাই, হানাহানি নাই,—সেখানে দুঃখ-কষ্টে জর্জর কোনো মানুষ নাই, কাহারো দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সে—মানুষ আশ্রিত নয়, সকলেই পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্যে আপন আপন অধিকারে সেখানে বাঁচিবে······ আজ যারা মৃতপ্রায়, নতুন জীবনী পাইয়া সেদিন তাহারা জাগিয়া উঠিবে···ভগীরথের মতো প্রাণ প্রদায়িনী জীবন-গঙ্গা আনয়ন করিয়া লইয়া যাইবে দারিদ্র্য অভিশাপগ্রস্ত কেশবদের মতো সেইসব মুমূর্ষু পৃথিবীতে···নতুন জীবনের আলোকে অসংখ্য পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে ··কিন্তু, যদি সে আর ভালো হইয়া না ওঠে? তবে? এই রূপরস বর্ণ-গন্ধময় পৃথিবী হইতে বিদায়ের চিন্তায় বরুণের সমস্ত বুক মথিত করিয়া কণ্ঠের কাছে একটা আবেগ ঠেলিয়া আসিল। বরুণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল কামালেরও শূন্য নির্নিমেষ দৃষ্টিও তাহার প্রতি নিবদ্ধ। সে তাহার হাতে ধরা হাতখানা আরো নিবিড় করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল।

বরুণের কথা মতো সংঘের সভ্যদের তাহাকে দেখিতে যাইবার অনুরোধ জানাইয়া কামাল ভাবিল, বাড়ির সকলেও তো তাহার অবস্থা জানিবার জন্য উদগ্রীব, তাহাদেরও খবর দিয়া যাই।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে সবই যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতেছিল। ঘরবাড়ি, দুনিয়া কোনোটাতেই যেন আর মন বসেনা। মনে কোনো সাড়া তোলেনা। একটা ঝিমঝিমে বিষন্নতা সর্বত্র—সকলের মুখেই ব্যপ্ত।

বৈঠকখানাঘরের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ চক্ষু তুলিয়া সেদিকে তাকাইয়া সেদিনকার রহমান সাহেব ও ইউনুস উকিলের তর্ক মনে পড়িল...মনে পড়িল পুরবীদির বাড়ির ঘটনার কথা...

উদগত দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া সে ঘরে পা দিল। ভিতরে কাহাদের কথা শোনা গেল, ঢুকিয়া দেখিল, রায়বাহাদুর আর মণিকা; তাহার মা ও শামিমকে তিনি যেন কী কহিতে-ছিলেন। তাহাকে দেখিয়া রায়বাহাদুর সস্নেহে কাছে ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। কামাল যথাযোগ্য উত্তর দিল।

—মুসড়ে পড়লে চলবে না, এই ছেলেকে আপনাকে মানুষ করে তুলতেই হবে।

কামালের মা রায়বাহাদুরের কথায় বিনীতভাবে হাসিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হাসি ফুটিল না। তাঁহার উপর দিয়া যেন একটা ঝাপটা বহিয়া গেছে।

হঠাৎ রায়বাহাদুরকে দেখিয়া বরুণ একটু বিস্মিতই হইয়া-ছিল। মা এবং শামিমের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইতেই মণিকা তাহা দেখিয়া তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গেল,—বাবা এসেছেন দেখে খুব অবাক হয়েছো কামালদা, না? বাবাকে

যতো খারাপ লোক সবাই ভাবে, উনি সত্যি সত্যি কিন্তু সেরকম—

কামাল লজ্জিতস্বরে কহিল,—আঃ আমি কী তাই বলেছি!

—বাবা তোমাদের খোঁজ খবর নিতে এসেছেন। এসে ভালোই হোলো, শামিমদি আমাদের স্কুলে চাকরী নেবেন।

—চাকরী!

—হ্যাঁ মাষ্টারি করবেন। উপার্জন করবার কেউ তো তোমাদের নেই, তাই বাবা বললেন, ঘরে বসে আছো, আই, এ, পর্যন্ত পড়েছো, এসো তুমি আমার স্কুলে, মাসে সত্তরটাকা করে মাইনে পাবে—

রহমান সাহেবের মৃত্যুর পর সংসার যে সত্যি সত্যিই এক অচল বিপদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কয়দিনে কামাল তাহা খেয়ালও করে নাই। একেই সংসার দরিদ্র, তাহার উপর পিতা এমন কোনো পুঁজি রাখিয়া যান নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সকলের খাওয়া এবং তাহার লেখাপড়া চলিবে। কোনোদিকে কোনো আত্মীয়জনও নাই। মা ভবিষ্যতের এই দুশ্চিন্তায় যে আরো কাতর, তাহা তাঁহার গতকল্য শামিমের সহিত আলোচনার কয়েকটি কথা হইতে কামাল অনুমান করিয়াছিল; দিদি যদি বাস্তবিকই চৌধুরী গার্লস ইনষ্টিটিউশনে চাকুরী নেয়, তাহা হইলে অন্তত: সেই দুর্ভাবনা তো তাহার ঘুচিবে।

খুশি হইয়া সে প্রশ্ন করিল,—সত্যি?

মণিকা হাসিয়া কহিল,—বারে! তবে কী আমি মিথ্যে বলছি?

রায়বাহাদুর উঠিলে কামালের মা কহিলেন,—আপনার এই সহানুভূতির ঋণ কোনোদিন ভুলবো না। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানানো ছাড়া—

রায়বাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন,—ছিঃ ছিঃ ঋণ কী বলছেন বোন, আর ধন্যবাদই বা কেন! আমার মা-মরা ছেলেমেয়ে যার স্নেহের ঋণে বাঁধা, তার কাছে আমার এই আসা, পরামর্শ দেওয়া—সবি কী ধন্যবাদের প্রত্যাশা নিয়ে? না, না—আপনি আপনার ঐ ভদ্রতার কথাটা ফিরিয়ে নিন, নইলে আমি রাগ করবো।

কামালের মনে হইল বহুদিন পরে সে মা'এর মুখে হাসি দেখিতেছে। তাঁহার শোকমলিন চক্ষু তারকা এবং মলিন মধুর ঠোঁট দুইটি যেন অনেকদিন পরে এক অজানা সান্ত্বনা বহন করিয়া আনিল।

একটু স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিয়া মণিকাকে জিজ্ঞাসা করিল—পান্না কোথায়?

—দাদা ড্রাইভারকে নিয়ে বরুণদার ওখানে গেল। আচ্ছা, বরুণদা ভালো হয়ে উঠবে?

বরুণের নাম উচ্চারণ শুনিয়া রায়বাহাদুর কামালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এসে শুনলাম, তুমি বরুণের ওখানে। কেমন আছে সে?

কামাল যথাযোগ্য উত্তর দিল।

রায়বাহাদুর এবং মণিকা চলিয়া যাইবার পর কামাল মাকে কহিল,—বরুণের অবস্থা খুবি খারাপ মা—চলো তাকে দেখে আসবে।

তিনি বরুণের বর্তমান অবস্থা জানিয়া কহিলেন—চল, যাচ্ছি।

বরুণের কাছে ইতিমধ্যে অনেকেই উপস্থিত। সুশীল, আনোয়ার, পান্নালাল, শেখর, শংকর, সিরাজ, প্রভৃতি সবুজ-সংঘের অনেক সভ্যরা। বরুণ তাহাদের সংগে খুশিমনে গল্পে রত। কণ্ঠস্বরও পূর্বাপেক্ষা একটু জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। সুশীল মাঝে মাঝে উৎসাহদীপ্ত স্বরে সংঘের ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনার বিষয় আলোচনায় মুখর।······

কিন্তু পরদিন সকাল হইতেই বরুণ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে কণ্ঠস্বর এমন হইল যে কাণ পাতিয়া শোনাও দায়। মনে হইল, ক্রমশঃই সে যেন নিজের পারিপার্শ্বিক সংপর্কে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছে।

বরুণের বাবা তখন কলিকাতায়। ডাক্তার লইয়া তখনো ফেরেন নাই। মা তো উদ্বেগে অধীর। যে শংকা হইতে মুক্তি পাইয়া একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছিলেন, পুনর্বার তাহা দেহে মনে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে যেন অসাড় করিয়া দিল।

অবশেষে বেলা দশটায় পরিমলবাবু ডাক্তারসহ আসিয়া

পড়িলেন। কিন্তু, সকলে আগ্রহ-কম্পিতভাবে তাহার মুখপানে চাহিলেও, তিনিও বিশেষ কোনো ভরসা দিতে পারিলেন না। বরুণের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়া চলিল। নাকমুখ দিয়া কালো রক্ত বহাইয়া অবশেষে বেলা তিনটায় তাহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল।

চতুর্দিকে তখন তুমুল কান্নার রোল। বুকভাঙা শোকে বরুণের মা মূর্ছিতা। সকলেরই চোখে উদগত অশ্রুজল।

শুধু পরিমলবাবু প্রস্তরীভূত সমস্ত আবেগ লইয়া বাহির বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুদূরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টিতে ছিল রোষ, ছিল ক্ষোভ, ছিল মানুষের অন্যায় ও অনাচারের প্রতি দুরন্ত করুণা...কামাল আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল···চোখ ঝাপসা···দুইটি ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছে···পরিমলবাবু যখন তাহার দিকে তাকাইলেন, উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে সে তাহার ক্রোড়ে ভাঙিয়া পড়িল···

পরিমলবাবু তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিলেন,—না না, কান্না নয়, প্রতিজ্ঞা করো কামাল অন্যায়ের অবসান করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করো কুচক্রীর উচ্ছেদের···

চক্ষু হইতে তখন তাঁহারও অবিরল জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

নিচে কলরব শোনা গেল কাহাদের। কামাল, পরিমলবাবু দুইজনেই উপর হইতে চাহিয়া দেখিলেন শহীদ বরুণের

জিন্দাবাদ কামনা করিয়া অসংখ্য তরুণেরা বাড়ির সম্মুখে জড় হইয়াছে। আসিয়াছে সুশীল, আসিয়াছে আনোয়ার ···আসিয়াছে সংঘের আরো অনেক তরুণ প্রাণ। তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে জনসাধারণ। আসিয়াছে সেই বস্তীর প্রতিটি আবালবৃদ্ধবনিতা···

কামাল সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার দুঃখ ভুলিয়া গেল। হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। শহীদের শব স্পর্শ করিয়া আজ এই বিশাল জনসংঘকে প্রতিজ্ঞা করাইতে হইবে মানুষের কল্যাণের···অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযানের···যে অন্যায়ের ফলে আত্মবলি ঘটিয়াছে দিবাকরদা'র, তাহার পিতার, বরুণের··· প্রতিটি চিত্তে মুদ্রিত করিতে হইবে তাহাকে উচ্ছেদের স্বাক্ষর...

ইচ্ছা হইল পরিমলবাবু বরুণের মা—দুইজনকেই আজ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়া সে বলিয়া ওঠে,—জানি, তোমাদের দুঃখের সীমা নাই; কিন্তু ওগো দুঃখাভিভূত জনক-জননী, তোমার এক সন্তানের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য আজ শত শত জন ছুটিয়া আসিয়াছি; যে অন্যায়ে মানুষে মানুষে ঘৃণা, মানুষে মানুষে বৈষম্য,—একের সুবিধার জন্য হাজার জন শিরে বহন করে দুঃখলাঞ্ছনা দারিদ্র্যের অভিশাপ, প্রতিটি চিত্তে তাহাকে উচ্ছেদের সংকল্প লইয়া···তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করো···আজ হইতে নবোদ্যমে আমাদের দুরন্ত যাত্রা শুরু হউক।